মাসুদ রানা

অপারেশন বসনিয়া

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অপারেশন বসনিয়া

কাজী আনোয়ার হোসেন

বসনীয় বাহিনীর এক বিশ্বাসঘাতক কর্নেল হাত মিলিয়েছে সার্বদের সাথে, দখল করে নিয়েছে মুসলিম বাহিনীর মূল অস্ত্র-ঘাঁটি—বসনিয়ার মানচিত্র বদলে দিতে চায় ওরা।

মানবিক সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে ছুটল মাসুদ রানা। ওর সাথে যোগ দিল গগল ও বুরুজ আলি।

পথে সার্বদের তাড়া খেয়েও শেষ পর্যন্ত জায়গামত পৌঁছল ওরা, প্রস্তুত হলো দুর্ভেদ্য ঘাঁটি মুক্ত করতে।

একদিকে হায়েনা সার্ব, অন্যদিকে বিষাক্ত সাপ, কোবরা। সফল হওয়ার ভরসা কম।

রুদ্ধশ্বাস, মরণপণ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ল ওরা।

তারপর?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

অপারেশন বসনিয়া

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

আঁধার হয়ে আসছে ধরণী। সূর্য ডুবে গেছে। ঝকঝকে নীল আকাশের কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। স্বল্পস্থায়ী বসন্ত গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে, আকাশ-বাতাস আর পাতাশূন্য গাছের ডালে সবুজ রঙের বিস্তার মহাব্যস্ত ইউরোপকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সে- কথা।

লন্ডন।

রানা এজেন্সি। নিজের বিলাসবহুল অফিসরুমের জানালার ভারী ড্রেপার খানিকটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা। গাড়ি-ঘোড়ার অবিরাম মিছিল দেখছে। আসলে দেখছে না, চোখ রাস্তায় থাকলেও মন পড়ে আছে আর কোথাও। অন্যমনস্ক। পিছনে বাঁধা হাতে সিগারেট পুড়ে চলেছে, টানছে না। ভুলেই গেছে হয়তো।

একটু পরই আলোয় আলোয় ঝলমল করে উঠল পৃথিবীর বৃহত্তম শহর লন্ডন। এবং সুন্দরতমও। চারদিকে নানান রঙের অজস্র নিওন সাইন জ্বলছে-নিভছে, সে আলোয় মিটিমিটি হাসছে অনন্ত যৌবনা নগরী। কত হাজারো বিজ্ঞাপনী সাইন—কোনটা ক্রমাগত বাঁ থেকে ডানে ছুটে যাচ্ছে, প্রান্তসীমায় পৌঁছে মুহূর্তের জন্যে পলক ফেলেই আবার শুরু থেকে আরম্ভ করছে দৌড়। কোন-কোনটা ওপর থেকে নিচে নামছে, অথবা জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখ পিট্-পিট্ করছে। সগর্বে নিজের নাম-পরিচয় ঘোষণা করছে ওরা।

প্রায় সবগুলো সাইন অটোম্যাটিক, দিনের আলোয় টান ধরলেই কাজ শুরু করে দেয় ইলেকট্রিক মেকানিজম। ভোরের আলো না ফোটা পর্যন্ত চলতে থাকবে। মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার দিনের বেলাও একইভাবে কাজ করে ওগুলো।

একটা সাইনের ওপর নজর থমকে গেল রানার—টকটকে লাল রঙের, নিয়মিত ছন্দে জ্বলছে-নিভছে। ওটা বলছে: HELL IS HERE···HELL IS HERE··· HELL IS HERE.

চোখ কুঁচকে উঠল ওর, সে আবার কি! ব্যাপার বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লাগল। আসলে রাস্তার ওপারের এক আকাশচুম্বী ভবনের আড়ালে পড়ে গেছে ওটার প্রথম অংশ। ডানদিকে কয়েক পা সরল'ও, এবার পুরোটা দেখা যাচ্ছে। সাইনটা আসলে বলছে: SUMMER SHELL IS HERE.

হাসির আভাস ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। ওটা বিখ্যাত এক ব্রিটিশ বিজ্ঞাপনী সংস্থার বিজ্ঞাপন। পরক্ষণে চেহারা বিগড়ে গেল আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতে।

পুড়ে শেষ হয়ে গেছে সিগারেট। দ্রুত পিছিয়ে এল। ডেস্কের ওপর রাখা অ্যাশট্রেতে গোড়াটা ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরাল। এরমধ্যে আবার ডুবে গেছে চিন্তায়। তবে বেশি গভীরে পৌছার সুযোগ হলো না, তার আগেই নক হলো বন্ধ দরজায়।

'এসো!' ভরাট গলায় আহ্বান জানাল ও।

ঘরে ঢুকল মানুষরূপী খুদে এক দানব। নাম বুরুজ আলি। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ সে, বুকের ছাতি ছেচল্লিশ। একেকটা বাহু রানার উরুর সমান মোটা। প্রচণ্ড শক্তিধর চওড়া কব্জি, তালু প্রায় ফুল সাইজ প্লেটের সমান। কাবুলী কলা সদৃশ মোটা আর দীর্ঘ আঙুল।

পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড গোল মুখে রাজ্যের সরলতা বুরুজ আলির। চোখ দুটো শিশুর চোখের মত নিষ্পাপ। মানুষটা যখন নিঃশব্দে হাসে, মনে হয় কোন অবোধ শিশু হাসছে।

সারাদেহে-মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ তার। ছাত্রজীবনের মারপিটের স্মৃতিচিহ্ন ওসব। বয়স সাতাশ-আটাশ। বাড়ি বরিশাল শহরের কাউনিয়ায়। বাংলা বলে বরিশালের শহুরে টানে। লেখাপড়া দু'বারের প্রচেষ্টায় টেনেটুনে ইন্টারমিডিয়েট পাস।

সরল-সোজা মানুষ। মনের কথা চেপে রাখতে জানে না।

যখন রেগে ওঠে বুরুজ আলি, অতিবড় কঠিন মানুষের কলজেও কেঁপে যায় তার তখনকার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে, পরিধেয় খারাপ হয়ে যায় প্রতিপক্ষের। অথচ এই দানবটিই ওর সামনে এলে একেবারে ভেজা বেড়াল হয়ে যায়, কথা বলে মেপে, আর হাঁটে যেন একরাশ ডিমের ওপর দিয়ে। বাঘের মত ভয় করে সে রানাকে। দুনিয়ার যত ভক্তি-শ্রদ্ধা তার কেবল এই একজনেরই প্রতি।

'কি ব্যাপার, বুরুজ আলি?' ভুরু নাচাল রানা।

'আইয়া পরছে,' নিজের পিছনটা দেখাল সে ইঙ্গিতে।

'গুড! নিয়ে এসো।'

'জ্বে,' বেরিয়ে গেল লোকটা। অটো শাটারের চাপে দরজা বন্ধ হয়ে গেল ধীরগতিতে। পুরো বোজার সময় পেল না, তার আগেই আবার নক করে ভেতরে ঢুকল দানব, সঙ্গে আরেকজন। প্রায় রানারই মত লম্বা আগন্তুক, তবে পাশে একটু বেশি। বয়সেও ওর চার-পাঁচ বছরের বড়। চোখা চেহারা। একহারা গড়ন। থুতনিতে চমৎকার করে ছাঁটা ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি। মেহদি রাঙানো।

ভিনসেন্ট গগল।

সেভিল রো-র নিখুঁত সুন্দর ছাঁটের বহুমূল্য সাদা কমপ্লিট স্যুটে রাজপুত্রের মত লাগছে তাকে। গায়ে হালকা নীল রঙের শার্ট, গলায় লালের ওপর ঘিয়ে রঙের বুটিওয়ালা টাই। মাথায় দামী জাল জাল সাদা হ্যাট। হাতে কারুকাজ করা ছড়ি। রানার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। দাঁতে কামড়ে ধরে আছে দামী চুরুট।

'হ্যালো, গগল!' হাসির সাথে স্বস্তিও ফুটল রানার মুখে। 'কেমন আছ?' হাত বাড়াল ও। গগলও।

হাড়-মাংস নয়, বহু পোড় খাওয়া দুই খণ্ড কাঠ যেন যুক্ত হলো পরস্পরের সাথে, সেঁটে থাকল অনেকক্ষণ। দীর্ঘ দিনের গভীর বন্ধুত্বের বন্ধন আরও বহুগুণ দৃঢ়

হলো ওদের। 'এই মুহূর্তে ভাল না,' বলল গগল। 'ইটালি থেকে মস্কো রওনা হওয়ার কথা ছিল আজই, অথচ তোমার খবর পেয়ে ছুটে আসতে হলো লন্ডন।'

একটা ভুরু উঁচু করল রানা। 'লাইন ওখান পর্যন্ত কবে পৌঁছল?'

'কমিউনিজম কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে,' বলেই হা-হা করে হেসে উঠল সে।

'কাজের মানুষ!' মৃদু গলায় বলল ও প্রশংসার সুরে। 'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি আমি।'

'আমিও, রানা। অনেকদিন পর দেখা হলো, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু না জেনে বোধহয় তোমার ব্যবসার ক্ষতি...'

'আরে গুলি মারো ব্যবসার! ব্যবসা একটা গেলে পাঁচটা পাব।'

বুরুজ আলির সাথে গগলকে পরিচয় করিয়ে দিল ও। দৃষ্টিতে প্রশংসা আর কৌতুক নিয়ে দানবকে দেখল ইটালিয়ান। হাত বাড়িয়ে দিল। করমর্দন সেরে রানার দিকে ফিরল সে। 'তারপর বলো, এত জরুরী তলব করেছ কেন?'

'বসো, ব্যস্ত হয়ো না। বুরুজ আলি, তুমিও বসো। এঁর সঙ্গে জরুরী আলাপ সেরে তোমাকে নিয়ে বসব আমি।' ইন্টারকমে তিন কাপ কফির নির্দেশ দিল রানা। দু'মিনিটের মধ্যে কফি এলো। পানের ফাঁকে সাধারণ এটা ওটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা দুই বন্ধু।

এদিকে বুরুজ আলি পড়েছে মহাফাঁপরে। সিগারেট-চুরুটের গন্ধ একদম সহ্য হয় না তার। কিন্তু সে কথা রানাকে বলার প্রশ্নই আসে না, তাই কষ্ট হলেও চেপে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। 'বুরুজ আলি, তুমি চেয়ার একটু সরিয়ে বোসো। ধোঁয়ায় অসুবিধে হচ্ছে তোমার।'

থতমত খেয়ে গেল দানব। 'জ্বে? জ্বে-না, আমার কোন অসুবিদা...'

'তবু সরে বসা ভাল। যাদের ধূমপানের অভ্যেস নেই তাদের অসুবিধে হওয়া স্বাভাবিক।'

'জ্বে,' মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল সে এর মধ্যেও ওর দিকে রানার খেয়াল আছে দেখে। সামান্য সরে বসল।

'কেন ডেকেছ বলো,' বলল গগল। হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসল। মুঠোয় ধরা ছড়ির হাতলের নকশা খুঁটছে বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে।

'আমার বেশ কিছু অস্ত্র-গোলাবারুদ প্রয়োজন,' টেবিলে ভর রেখে ঝুঁকে বসল রানা। 'খুব তাড়াতাড়ি।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ইটালিয়ান। 'নো প্রবলেম। কি কি চাই, নাম বলো।'

'তালিকাটা বেশ লম্বা,' ডানদিকের ওপরের ড্রয়ার খুলে টাইপ করা একটা শীট বের করল ও। এগিয়ে দিল সামনে। 'পড়ে দেখো।'

ওতে চোখ বোলাল গগল। দৃষ্টি তালিকার মাঝ বরাবর পৌঁছার আগেই শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল, একটু একটু করে কপালের দিকে রওনা হলো তার ভুরু। পড়া শেষ হতে দম ছাড়ল সশব্দে। 'মাই গড, রানা! এতসব দিয়ে কি করবে! কোন্ দেশ দখল করতে যাচ্ছ তুমি, বুলগেরিয়া, না আলবেনিয়া?'

মুচকে হাসল ও। 'ঠিক দু'দিন পর আইটেমগুলো পৌছে দিতে হবে বিশেষ এক জায়গায়। কাছেই। সম্ভব?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ইটালিয়ান। তর্জনী দিয়ে ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ির নিচের চামড়া চুলকাল খস্ খস্ শব্দে। 'এ আবার কঠিন কোন কাজ হলো নাকি? কোথায় পৌছে দিতে হবে মাল?'

'ইওরোপেই। তোমার বাড়ির উল্টোদিকে।'

চট্ করে কুঁচকে উঠল গগলের মসৃণ, চকচকে কপাল। 'মানে?'

'ডালমাটিয়ান কোস্ট।'

বাঁ কনুই টেবিলে রেখে ভর দিল সে, বন্ধুকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। 'বসনিয়া?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'ঠিক। অ্যাপথস যাবে ওসব।'

'অ্যাপথস,' পুনরাবৃত্তি করল গগল। 'মুসলিম বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্রের মূল ঘাঁটি। কিন্তু ওটা এখন তাদেরই এক বিদ্রোহী গ্রুপের দখলে। এক কর্নেল, কি যেন নাম, বিদ্রোহ করেছে, না?'

'হ্যাঁ,' বলল ও।

ফোঁস করে দম ছাড়ল ইটালিয়ান। 'এইবার বুঝলাম কি কাজে লাগবে এতসব। কিন্তু, রানা, তুমি ওখানকার লেটেস্ট পরিস্থিতি জানো? যেজন্যে যেতে চাইছ, তা যে কতবড় দুঃসাধ্য কাজ, বুঝতে পারছ নিশ্চই?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। 'পারছি।'

অন্যমনস্ক দেখাল গগলকে। 'আমার কি মনে হয়, জানো? মনে হয় বসনিয়া শেষ হয়ে গেছে। যত গোলা-বারুদই নিয়ে যাও, কোন কাজ হবে না। যদি কাল সকালের খবরেই শুনি দুবরোভনিক থেকে ডালমাটিয়ান কোস্টের পুরোটা উপকূল জুড়ে সার্বরা দাঁড়িয়ে গেছে লাইন বেঁধে, অ্যাড্রিয়াটিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, আমি অন্তত অবাক হব না।'

'পরিস্থিতি খারাপ,' বলল ও। 'সন্দেহ নেই। তবে তুমি যতটা ভাবছ ততটা নয়। আর আমার ওখানে যেতে চাওয়ার কারণও অন্য।'

'অর্থাৎ তোমাকে যেতেই হবে, এই তো?' মুচকে হাসল ইটালিয়ান। 'বুঝেছি। হাজার হোক, ওরা মুসলমান।'

'ঠিক বললে না,' গম্ভীর হয়ে গেল ও। মাথা দোলাল। 'সবার ওপর ওদের আরেক পরিচয় আছে, গগল, সেটা হচ্ছে ওরাও মানুষ। ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকার পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতির মত ওদেরও আছে। ভেবে দেখো, যুগ যুগ ধরে যে সব প্রজাতন্ত্রের ঘাড়ে সিন্দবাদের ভূতের মত চেপে বসে ছিল রাশিয়া, কমিউনিজমের পতনের পর তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে আলাদা হয়ে গেছে। প্রথমে খানিকটা আঁইগুঁই করলেও পরে বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে মস্কো।

'সবাই যার যার পুরানো সীমান্তে বেড়া তুলে দিয়েছে। ভালই আছে ওরা, কেউ কাউকে খোঁচাচ্ছে না। প্রতিবেশী ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাচ্ছে না, কিন্তু সার্বিয়া বসাচ্ছে। এত বছরের প্রভুগিরির মেজাজ ছাড়তে পারছে না বেলগ্রেড। বসনিয়া-ক্রোয়েশিয়াকে তাদের নিজের জমি পুরোটা ফেরত দিতে রাজি নয় সে। ক্ষমতা আছে, তাই জোর করে কেড়ে নেবে। বাধা পেয়ে এখন মেরে সাফ করে

দিতে চাইছে তারা ওদের। বসনিয়ান বা ক্রোয়াট, দুই-ই সার্বদের সমান চোখের কাঁটা। কারণ ওদের সাগরের সাথে সরাসরি সংযোগ আছে।'

'সরি, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলল গগল। 'আমি আমার মন্তব্য ফিরিয়ে নিচ্ছি। আসলে এতকিছু ভেবে বলিনি আমি কথাটা।'

'তা আমিও খুব ভালই জানি, গগল। তোমাকে আমি চিনি। যেখানেই দুর্বলের ওপর সবলের অন্যায়-অত্যাচার, সেখানেই তোমাকে আমি দেখেছি বহুবার, দুর্বলের পাশে। তাই তো তোমাকেই…'

'আহ্!' পলকে কান-গাল টকটকে লাল হয়ে উঠল ইটালিয়ানের। আড়চোখে একটু দূরে বসা দানবকে দেখল সে। 'বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথায় এসো!'

'বেশ। সময়মত মাল পৌঁছে দিতে পারছ তো?'

'আমার তরফ থেকে না পারার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে…'

'তবে কি?' ঝুঁকে বসল রানা।

'মাল নিয়ে ওখানে পৌঁছানো সম্ভব হবে কি না ভাবছি। শুনলাম সার্ব কোস্ট গার্ড বহরের শক্তি বাড়ানো হয়েছে এরমধ্যে। একবার যদি টের পেয়ে যায়…'

'পাবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও।

চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল ইটালিয়ানের। 'তুমি জানলে কি করে?'

'জানি। কারণ আয়োজনটা আমিই করেছি।'

'কি আয়োজন?'

'সার্বদের ডাইভার্ট করার। তোমার মাল যেদিন পৌঁছবে, সেদিন গোটা চারেক বোট ওই এলাকায় ঘুর ঘুর করবে। সময়মত ভুয়া খবর সরবরাহ করা হবে সার্বদের, জানানো হবে ওগুলোয় করে বসনিয়ানদের জন্যে অস্ত্র যাচ্ছে। তারা যখন ওগুলোকে ধাওয়া করার কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন অন্য রুট দিয়ে আসল জিনিস…'

'ব্যস্, ব্যস্!' ডানহাত তুলল গগল। 'আর বলতে হবে না, বুঝে ফেলেছি আমি।'

নড়েচড়ে বসল বুরুজ আলি। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অভিভূতের মত চেয়ে আছে রানার দিকে। ভাব দেখে মনে হয় ওর পরিকল্পনা খুব মনে ধরেছে।

'ওখানে যেতে চাওয়ার অন্য কি কারণ আছে বলছিলে তখন, রানা?' প্রশ্ন করল ইটালিয়ান।

'হ্যাঁ,' আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। নীরবে টানল কিছুক্ষণ। 'কয়েক বছর আগে বেলগ্রেডে আমার এজেন্সির ছোটখাট এক লিয়াজোঁ অফিস ছিল। খুব সীমিত কাজকর্ম করত। ওখানকার চীফ ছিল ইয়োগোস্লাভ আর্মির এক রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার, সুলেমানোভিচ কিয়েরযেক। আমার বন্ধু মানুষ। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর চিটাগাং আর চালনা বন্দরে মুক্তিযোদ্ধা আর মিত্রবাহিনীর ডুবিয়ে দেয়া জাহাজ সরিয়ে চ্যানেল পরিষ্কার করার কাজে মেইনলি রাশিয়াই সাহায্য করেছিল আমাদের, তবে ওদের সাথে কিছু কিউবান, কিছু ইয়োগোস্লাভিয়ানও ছিল। কিয়েরযেক তাদের একজন। বাংলাদেশে সস্ত্রীক থেকে গেছে সে তখন চার-পাঁচ মাস। সেই সময় পরিচয় আমাদের। চমৎকার মানুষ ওরা।'

'তারপর?'

'ওদেশের আর সব রিটায়ার্ড অফিসারের সাথে কিয়েরযেকও পরে সার্বদের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে যোগ দেয়। সে-ই ছিল অ্যাপথস ঘাঁটির ইন-চার্জ।'

'আই সী!'

'আর ওর শ্বশুর হচ্ছেন বসনীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।'

ঝুঁকে এল ভিনসেন্ট গগল। কুঁচকে উঠল চোখ। 'জেনারেল স্টানিস্লাভ ইসমাইলোভিচ?'

'হ্যাঁ।'

আবার নড়ে উঠল বুরুজ আলি। উসখুস করছে ভেতরে ভেতরে।

'তারপর?' চুরুটে পর পর কয়েকটা চুমুক দিল ইটালিয়ান।

'গত সপ্তায় বাইরে থেকে আসা অস্ত্রের চালান রিসিভ করতে বন্দরে আসেন শ্বশুর-জামাই। সেখানে হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে তাঁদের কিছু অফিসার, কর্নেল কারমানোভিচ কোরুলার নেতৃত্বে।'

'আই সী!'

'এই লোকই নাটের গুরু। সাথে সাধারণ সৈন্যও ছিল কয়েকজন, তাদের সাহায্যে শ্বশুর-জামাই দু'জনকেই বন্দী করে সে জেটিতে সাজানো এক "বন্দুক যুদ্ধের" মাধ্যমে, তারপর রটিয়ে দেয় জেনারেল আর ব্রিগেডিয়ার অচেনা বন্দুকধারীদের গুলিতে মারা গেছেন।'

'আসলে মিথ্যে?' দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল গগলের।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছেন তাঁরা?'

'অ্যাপথসেই। বন্দী করে রেখেছে সেই কর্নেল।'

'কেন? বাঁচিয়ে রেখেও এমন খবর কেন রটাল?'

'সঠিক কারণ জানি না। তবে যতদূর জানতে পেরেছি, এটা সার্বদের একটা চাল। অ্যাপথসের ওপর প্রথম থেকেই নজর ছিল ওদের, জানে ওই ঘাঁটি দখল করা মানেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় করা।'

'বুঝলাম। কিন্তু এই কর্নেল কেন পা দেবে সার্বদের ফাঁদে?'

'লোকটা মদ আর মেয়েমানুষের ব্যাপারে ভীষণ দুর্বল। ঘাঁটির বাইরে গ্রামের এক সুন্দরী খ্রিস্টান বিধবার সাথে সম্পর্ক আছে তার। যতদূর জানা গেছে, সেই মেয়েটির মাধ্যমে সার্বরা তাকে ওঁদের দু'জন আর অ্যাপথস তাদের হাতে তুলে দেয়ার বিনিময়ে অবিশ্বাস্য অঙ্কের নগদ টাকার লোভ দেখিয়েছে। এ ধরনের মানুষের বেশিরভাগেরই নীতির বালাই থাকে না। টাকার জন্যে এমন কিছু নেই যা ওরা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।

'তাই বলে মুসলমান হয়ে...' থেমে গেল সে কথা শেষ না করে।

'মুসলমানই তো মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু, গগল,' মুখ নামিয়ে নিল রানা। আঙুলের নখ পরীক্ষা করতে লাগল। 'এতবড় বিশ্বাসঘাতক জাতি দুনিয়ায় দ্বিতীয়টা আছে বলে জানা নেই আমার। না হলে পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, দুটোই অন্যরকম হত। মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই এর ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখতে পাবে।'

চুপ করে থাকল সবাই। নীরবতা জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে ওদের বুকে। পালা করে ওদের দুই বন্ধুকে দেখছে বুরুজ আলি।

'কর্নেল অ্যাপথস দখল করেছে সার্বদের হাতে তুলে দেয়ার জন্যে?' বিস্ময় যেন কাটতে চায় না গগলের। 'ওরা এসে ঘাঁটি গাড়বে বসনিয়ার পেটের মধ্যে?'

'গেড়ে যদি বসেই, বাধা দেয়ার আছে কেউ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'বসে একটু আড়মোড় ভেঙে যদি অ্যাড্রিয়াটিক পর্যন্ত একটা করিডর বের করে নিতে পারে ওরা, তো করবে না কেন? বসনিয়ার ভেতর দিয়ে হোক, অথবা ক্রোয়েশিয়ার, সাগর পর্যন্ত সরাসরি যাওয়ার একটা রাস্তা ওদের চাই, এই যুদ্ধের মূল কারণই তো সেটা।'

'তো, তুমি যাচ্ছ বন্ধু আর তার শ্বশুরকে উদ্ধার করতে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি,' কপালের এক পাশ চুলকাল সে। 'সারায়েভো নিশ্চই জানে জেনারেল আর তাঁর জামাইয়ের কথা?' রানাকে মাথা দোলাতে দেখল। 'তাহলে ওরা কেন ওঁদের মুক্ত করার ব্যবস্থা নিচ্ছে না? সোফিয়াকে তোমার সাহায্য কেন চাইতে হচ্ছে?'

'সারায়েভো চেষ্টা করেছে দু'বার, দুটো প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। অ্যাপথস ভীষণ দুর্গম জায়গা। যাওয়ার দুটোমাত্র রাস্তা, দুটোই সীল করে দিয়েছে কোরলা, এগোনোর উপায় নেই। আকাশপথেও করা সম্ভব নয় কিছু, তাতে পুরো ঘাঁটির মজুত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।'

'বড় কঠিন অবস্থা,' আনমনে বলল গগল।

'মাল নির্দিষ্ট সময়ই চাই আমার। এদিক-ওদিক হয়ে গেলে অসুবিধেয় পড়ে যাব।'

'হবে না। ঠিক সময়ই পেয়ে যাবে।'

'দাম যা আসবে,' বলল রানা। 'তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল গগল। 'ভুলে যাও, রানা। ব্যবসা তো সারাজীবনই করে গেলাম। এগুলোর জন্যে তোমাকে পয়সা দিতে হবে না। ভেবে নাও বসনিয়ানদের ন্যায়যুদ্ধে এ আমার তরফ থেকে সামান্য কন্ট্রিবিউশন হিসেবে যাচ্ছে।'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু-ফিন্তু নেই। ওদের এই একটু সাহায্য করতে পারলে আমি বরং খুশিই হব।'

'বেশ।'

তাজ্জব হয়ে গেল বুরুজ আলি। শুধু বেশ! রানার দিকে তাকিয়ে ভাবল, কতবড় একটা উপকার করতে চাইছে মানুষটা, কোথায় তাকে ধন্যবাদ জানাবে, বাহবা দেবে, তা নয়, শুধুই বেশ!

তার জানা নেই রানা-গগলের বন্ধুত্ব একটু অন্য ধরনের। অসাধারণ। ওদের বন্ধুত্বের অভিধানে হালকা ধন্যবাদ বলে কোন শব্দ নেই। 'উপকারের বিনিময়ে উপকার' নীতিতে বিশ্বাসী দু'জনে। গগলের আজকের এই উপকারের ঋণ মাসুদ

রানা ভবিষ্যতে শোধ করবে তার কোনও উপকার করে। সে যত কঠিন আর দুঃসাধ্যই হোক না কেন।

গগলকে মুখ খুলতে দেখে সেদিকে মন দিল বুরুজ আলি।

'কড়া অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি, রানা। অনেকদিন অনিশ্চিত দৌড় ঝাঁপে অংশ নেয়ার সুযোগ হয়নি। ভাবছি মাল নিয়ে আমিই জায়গামত হাজির হয়ে যাব কি না।'

'তুমি!' কৌতুক ও বিস্ময় ফুটল ওর চেহারায়। 'দূর! পাগল নাকি? কাজ-কর্ম ফেলে তুমি কেন যাবে?'

'তুমিও কি কাজ-কর্ম ফেলে যাচ্ছ না?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

'কামন, গগল! কিয়েরযেক আমার বন্ধু...'

'আর মাসুদ রানা আমার বন্ধু।'

ও ঠাট্টা করছে না বুঝতে পেরে সিরিয়াস হয়ে উঠল রানা। 'শুধু শুধু এ সবের সাথে জড়ানো ঠিক হবে না তোমার। এসব ক্ষেত্রে কখন কি হয়, বলা যায় না।'

'যায় না,' গোবেচারা মুখ করে বলল ইটালিয়ান। 'তা জেনেও তুমি যদি তোমার বন্ধুকে সাহায্য করতে যেতে পারো, আমি কেন আমার বন্ধুকে সাহায্য করতে যেতে পারব না?'

'শোনো...'

'শুনব না,' বাধা দিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'কারণ এত উপদেশ শুনতে ভাল লাগে না আমার।'

নীরবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। 'সত্যি যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ।'

আবার কিছু সময় তাকে দেখল ও, তারপর হেসে উঠল নীরবে। 'বেশ তো, চলে এসো। দু'জন থাকলে মন্দ হবে না।'

'এই তো বুঝেছ!' গগলও হাসল অনাবিল হাসি। 'বহু দিন পর তোমার সাথে দেখা, আবার কবে হবে না হবে কে জানে? তাই এত তাড়াতাড়ি বিচ্ছিন্ন হতে মন চাইছে না।'

'ঠিক বলেছ। আমারও না।'

এতক্ষণ বহু কষ্টে চুপ করে ছিল বুরুজ আলি, আর পারল না। মুখের সামনে মুঠো তুলে ভয়ে ভয়ে কেশে উঠল খুক্ করে। ঘুরে তাকাল ওরা। 'কিছু বলবে?' প্রশ্ন করল রানা।

মাথা চুলকাল দানব। 'জে। আমারেও যদি নেতেন লগে, টেরনিংটা কামে লাগাইতে পারতাম।'

'সে কি! তোমার হাতের কাজগুলো কে করবে তাহলে?'

আমতা আমতা করতে লাগল দানব। 'সব ছোড় ছোড় কাম, রানা ভাই। আরেকজনরে বুজাইয়া দিয়া যাইতাম আমনে কইলে। টেরনিং লইয়া বইয়া রইছি, একটা কামের মত কাম যদি করতে পারতাম...'

শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল রানা। কথাবার্তা সেরে গগল বিদায় নিল। খুশিতে ডগমগ বুরুজ আলিও বেরিয়ে গেল গোছগাছ করতে। একা হতেই গভীর চিন্তায়

ডুবে গেল রানা। আনমনে তাকিয়ে আছে সামনে। তাড়াহুড়োয় পর্দা টানা হয়নি তখন, ফাঁক দিয়ে সেই সাইনটা দেখতে পাচ্ছে ও।

আগের মত একই কথা বলছে: HELL IS HERE···HELL IS HERE···HELL IS HERE.

দুই

গভীর রাত। অ্যাড্রিয়াটিকের ওপর দিয়ে মাঝারি গতিতে কোনাকুনি ছুটে চলেছে খুদে একটা দুই এঞ্জিনের বিমান। নাম পাথফাইন্ডার। চেহারা একেবারেই সাধারণ, হাবাগোবা ধরনের। অ্যামেচার পাইলটরা যেগুলোর মাধ্যমে আকাশে ওড়ার একেবারে প্রাথমিক ট্রেনিং নেয়, তার থেকে সামান্য বড়। বাতাসের চাপে একবার এদিক, একবার ওদিক করছে।

ইটালির পেসকারা থেকে আকাশে উড়েছে বিমানটা। ওটাও অ্যাড্রিয়াটিকের তীরে। সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছলেই বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। খুব বেশি প্রশস্ত নয় এখানে সাগর, দুইশো মাইলের সামান্য কিছু বেশি হতে পারে। কয়েকটা খুদে দ্বীপকে সযত্নে পাশ কাটিয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে পাথফাইন্ডার। ওগুলোয় জেলেরা ছাড়া কেউ থাকে না তেমন।

বিমানটা গগলের। কয়েক ঘণ্টার জন্যে ধার নিয়েছে মাসুদ রানা। আকাশে উড়েছে ওরা এক প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ থেকে। ওটার মালিক খুব ভাল করে চেনে ভিনসেন্ট গগলকে, ওর কাজের প্রকৃতিও জানে। কাজেই অসময়ে হলেও গগল স্বয়ং হাজির হয়ে যখন জানাল, এখনই 'বিশেষ কাজে' তার কয়েক বন্ধুকে পেসারো যেতে হবে, একটা প্রশ্নও করেনি সে। ইটালিয়ান এয়ার ট্রাফিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেতেও সময় লাগেনি তেমন।

গগলের জন্যে এসব কাজ খুশিমনেই করে স্ট্রিপের মালিক লোকটা, কারণ মাস শেষে তার তরফ থেকে যে নগদ 'শুভেচ্ছা' নিয়মিত পায় সে, অঙ্কটা অবিশ্বাস্য।

পেসারোর দিকে মিনিট পনেরো এগিয়েছিল পাথফাইন্ডার, তারপর উচ্চতা কমিয়ে আইএটি-র রাডারকে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে গেছে সাগরের দিকে। অবশ্য ওটার উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টা কর্তৃপক্ষের 'চোখে পড়েনি', কারণ ওরাও গগলের 'শুভেচ্ছা' খায়।

বিমান চালাচ্ছে ইটালিয়ান এয়ার ফোর্সের এক রিটায়ার্ড পাইলট, গগলের ব্যক্তিগত নেভিগেটর। পাশে বসে ঝিমুচ্ছে তার সহকারী। পিছনের অন্ধকার খুদে কেবিনে দুই রাজকীয় আসনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে রানা ও বুরুজ আলি। আইলের দু'দিকে বসেছে ওরা। পরনে কমব্যাট ইউনিফর্ম, তার ওপর ওয়েব হার্নেস। অসংখ্য ছোটবড় পকেট তাতে, ম্যাগাজিন-গ্রেনেড ইত্যাদি রাখার জন্যে।

দু'জনেরই সবগুলো পকেট বোঝাই। মাথার হেলমেট খুলে রেখেছে ওরা পাশের আসনে। হাতে, মুখে, গলায় কালো রঙের বিশেষ এক ক্রীম মেখে ভূত

সেজেছে। পিঠে বাঁধা প্যারাস্যুটের বোঁচকার জন্যে হেলান দিয়ে বসতে অসুবিধে হলেও ওগুলো খুলে রাখার কথা ভাবেনি পর্যন্ত মাসুদ রানা। কখন জরুরী পরিস্থিতি দেখা দেয় কে জানে!

কোথাও কোন আলো জ্বলছে না পাথফাইন্ডারের—কেবিন লাইট বা দুই উইঙের নেভিগেশন লাইট, রেডিও দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অফ করে দেয়া হয়েছে। রাডার স্ক্রীনের সামান্য সবুজাভ আলোয় কিছুই স্পষ্ট নয়, সব আবছা ভেতরে। শুধু রাডারের সাহায্যে নেভিগেট করছে পাইলট, গন্তব্য যত কাছিয়ে আসছে, উদ্বেগও ততই বাড়ছে তার।

অন্তত রেডিওটা চালু রাখা গেলে ভাল হত, কিন্তু হুকুম নেই। মাসুদ রানার কড়া নির্দেশ, কোন অবস্থাতেই রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করা যাবে না। এই মুহূর্তে বিষয়টা সুবিধের ঠেকছে না নেভিগেটরের, কেবলই মনে হচ্ছে কোন বড় রকমের বিপদে পড়তে যাচ্ছে তারা।

সান্ত্বনা একটাই, পাথফাইন্ডারের রাডার ব্যবস্থা অত্যাধুনিক। ফ্লাইট ডেকে ডিশ অ্যান্টেনা আকৃতির খুদে এক ডিশ বসানো আছে, অনবরত ঘুরছে। স্ক্রীনে সারাক্ষণ দুটো শক্তিশালী আলোর বীম শো করছে ওটা। পাহাড়, জাহাজ, এয়ারক্র্যাফট, যা-ই পড়ুক পথে, সবকিছুর আলাদা আলাদা ইমেজ পর্দায় দেখাতে পারে ওটা।

নিজের সীটে যতটা সম্ভব আরাম করে বসে আছে রানা। চোখ বন্ধ। পড়ে আছে ঝিম মেরে। সামনের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। বুরুজ আলিকে বেশ আনমনা দেখাচ্ছে। বুটসহ এক পা সীটের ওপর তুলে দিয়ে বসেছে সে—মনটা হারিয়ে গেছে অতীতে। ভাবছে তার দেশের কথা, বাবা-মা, ছোট ভাই-বোনের কথা। কাউনিয়া প্রথম গলিতে গোপাল কবিরাজের বাড়ির পাশেই তাদের ছবির মত ছোট্ট, সুন্দর বাড়িটার কথা।

বাড়ির সামনের আঙিনায় একটা আতা গাছ লাগিয়েছিল বুরুজ আলি। কত বড় হয়েছে গাছটা? ফল ধরেছে? পাশের বাড়ির সেই পুতুলের মত মেয়েটি···বিমান দুলে উঠতে নড়েচড়ে বসল সে—আবার তলিয়ে গেল।

কাউনিয়ার উঠতি মাস্তান দলের নেতা ছিল সে কোন এক সময়। কাছের আরেক মহল্লা, আলেকান্দার সমবয়সী মাস্তানদের সাথে মারপিট সব সময়ই লেগে থাকত তার দলের। সামান্য ছুতোনাতা পেলেই একদল লাফিয়ে পড়ত অন্যদলের ঘাড়ে। এমনিতে দশাসই দেহের অধিকারী, তারওপর মারপিটেও ছিল সে যথেষ্ট সিদ্ধহস্ত। পরোয়া করত না কাউকে, কোথাও মারপিট বাধলেই হলো, ঝাঁপিয়ে পড়ত বুরুজ আলি বাঘের মত। শত্রুপক্ষ তার শ্রীমুখের দর্শন একবার পেলেই হলো, পালাবার পথ পেত না। নিজ দলের তো বটেই, বিপক্ষের ছেলেরাও এই কারণে তাকে দুরমুজ আলি ডাকত।

মাস্তানী করতে গিয়ে পড়াশুনা উঠল লাটে। কলেজে দলাদলি এমনিতেই বেশি, তার সাথে জড়িয়ে প্রথমবার আই এ পরীক্ষায় ফেল করে বসল। পরেরবার বহু কষ্টে টেনেটুনে পাস করল বটে, কিন্তু বাবার গালমন্দের ঠেলায় বাড়িতে টেকা মুশকিল হয়ে গেল। পালাল সে, খুলনা গিয়ে আর্মিতে নাম লেখাল। পরে কমান্ডো বাহিনীর

জন্যে তাকে বাছাই করা হলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, কঠোর ট্রেনিঙের শেষ পর্যায়ে বাঁ হাতের কবৃজি ভেঙে গেল তার, হওয়া চাকরিটা হাতছাড়া হয়ে গেল। সুস্থ হয়ে অন্য কোন কাজের সন্ধানে বের হলো বুরুজ আলি, ঘুরতে ঘুরতে জুতোর তলা ক্ষয়ে পায়ের গোড়ালি ধরে ধরে অবস্থা, এমন সময় একদিন বিসিআইয়ের কাভার ফ্রন্ট, ন্যাশনাল ট্রেডিং কোম্পানির অফিসে এল সে। আসার কারণ শুনে রিসেপশনিস্ট প্রায় বিদায় করেই দিয়েছিল।

হঠাৎ মাসুদ রানার মুখোমুখি পড়ে গেল সে, ও তখন ঢুকছে। হতাশ চেহারার দৈত্যাকার যুবককে দেখে নজর আটকে যায় ওর। আসার কারণ জেনে সাধারণ দুয়েকটা প্রশ্ন করে তাকে রানা, তারপর নিজের একটা কার্ড ধরিয়ে দিয়ে দেখা করতে বলে পরদিন। এল সে। প্রথম চোটে বেশ ভড়কে গিয়েছিল মাসুদ রানার অফিস ইত্যাদি দেখে। সাহস হচ্ছিল না ওর সামনে চেয়ারে বসতে। মানুষটার চুম্বকের মত ব্যক্তিত্বের সামনে জড়োসড়ো হয়ে ছিল সে। মনে হয়েছে, হাজার ওয়াটের কয়েকটা বালব্ জ্বলে যেন রানার মধ্যে, সে আলোয় ওর কোমল-কঠোর মনটা স্পষ্ট দেখা যায়, পড়া যায়।

আধ ঘন্টা কথা হয় সেদিন দু'জনের। ওর কাগজপত্র দেখল রানা। বুরুজ আলির অতীতের প্রায় সমস্ত ঘটনা জেনে নিয়ে কমান্ডো ট্রেনিঙের ব্যাপারে এটা-ওটা প্রশ্ন করল। আরও তাজ্জব হয়ে যায় বুরুজ আলি, ভেবে পায়নি লোকটা এত কিছু জানল কি করে! এরপরই আসে আসল ধাক্কা। 'আমার কাছে তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে,' বলেছিল রানা।

'জ্বে!' থতমত খেয়ে যায় বুরুজ আলি।

'আমি দেখতে চাই কেমন কমান্ডো তুমি।'

না বুঝে মাথা দুলিয়েছে সে। 'জ্বে।'

'আমার সাথে এক্সারসাইজে অংশ নিতে হবে তোমাকে।'

মনে মনে হেসেছে বুরুজ আলি। দুর্ঘটনা ঘটা পর্যন্ত সে-ই ছিল ব্যাচের এক নম্বর, সব কিছুতে। তাকে কি না পরীক্ষা করবে এক সিভিলিয়ান? ভাবল হয়তো ঠাট্টা করছে মানুষটা।

কিন্তু যেদিন শুরু হলো এক্সারসাইজ, সেদিন বুঝল 'ঠ্যালা কারে কয়'। একটু একটু করে সাইজ হতে লাগল বুরুজ আলি। ঝাড়া এক মাস ধরে চলে ব্যাপারটা, অসম্ভব কঠিন সব লেসন। রোজই নরক দর্শন করিয়ে ছেড়েছে তাকে রানা। এর তুলনায় আর্মির ট্রেনিং যে কত শিথিল ছিল, হাড়ে হাড়ে টের পেল সে।

অবশেষে একদিন সন্তুষ্টির হাসি ফুটল রানার মুখে। 'এবার তুমি নিজেকে একজন সত্যিকার কমান্ডো ভাবতে পারো,' তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছে ও।

ততদিনে মাসুদ রানার একনিষ্ঠ ভক্ত বুরুজ আলি। ওর হুকুম হলে সে করতে পারে না, এমন কাজ দুনিয়াতে আছে বলে মানতে রাজি নয় সে। কিন্তু যেদিন আন আর্মড কমব্যাট ট্রেনিং শেষ করে গুরুর প্রশংসা পেল, সেদিন থেকে সে হয়ে গেল অন্ধভক্ত। কেউ ওর সামনে রানার বিরুদ্ধে কিছু করে বা বলে দেখুক।

চোখ মেলল বুরুজ আলি। রানার দিকে তাকাল। মনে হলো ঘুমিয়ে আছে

মানুষটা। কাবুলী কলা দিয়ে সীটের গদিমোড়া হাতলে তবলা বাজাতে শুরু করল সে, খুব নিচু কণ্ঠে; যাতে রানার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে, গান ধরল, 'বন্দু তিনদিন তোর বারিত গেলাম দেহা পাইলাম না-আ-আ বন্দু তিনদিন…'

আচমকা ককপিটের দরজা খুলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা পাইলটকে। চেহারা দেখার উপায় নেই, তবে তার অস্থির নড়াচড়া দেখলে বোঝা যায় ব্যস্ত হওয়ার মত কিছু ঘটেছে। ককপিট থেকে রেডিওর খড়মড় আওয়াজ আসছে—কেউ চেঁচাচ্ছে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

'সেনিয়র!'

সোজা হয়ে বসল মাসুদ রানা। 'কি হয়েছে?'

'আমরা বোধহয় ধরা পড়ে গেলাম,' কেঁপে গেল তার গলা। 'নিচের এক রাডার ট্রেস্ করে ফেলেছে আমাদের পজিশন, ওটা কাদের বলতে পারছি না। পরিচয় জানাবার জন্যে ধমকাচ্ছে।'

'কখন টের পেল?'

'এইতো, মিনিটখানেক হবে বোধহয়।'

'আমরা এখন কোথায়?' ব্যস্ত হয়ে সিগারেট ধরাল ও। হাত কাঁপছে অল্প অল্প।

'উপকূলের কাছে। সামনে দিনারিক আলপস্।'

চিন্তায় পড়ে গেল ও। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'সেনিয়র…' সহকারীর হাঁক শুনে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। 'কি!'

'ওরা সার্ব!' চেঁচিয়ে বলল কো-পাইলট। 'পিছনের করকুলা দ্বীপ থেকে কথা বলছে। মনে হয়…মনে হচ্ছে ন্যাভাল শিপ! নোভি পাযার এয়ারবেসকে এইমাত্র আমাদের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিয়েছে ওটা। ওরা…ওরা বোধহয় প্লেন পাঠাচ্ছে। নির্ঘাত মিগ।'

'কাম সারছে!' ঝট্ করে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল বুরুজ আলি।

'তাহলে আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত, সেনিয়র,' বলল পাইলট। ভয়ে ঠিকমত কথা ফুটছে না তার গলা দিয়ে। 'সত্যি যদি মিগ আসে, পাখির মত গুলি করে ফেলে দেবে…'

'দাঁড়ান,' শান্ত কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল রানা, সুবিধে হলো না। ঠিক ছিল আলপসের কাছের ছোট শহর ইজানে নামবে ওরা, তা বোধহয় হলো না। যদি সত্যি সত্যি মিগ তাড়া করে...

'লিমিটেশনের বাইরে বেশি ঘোরাঘুরিও করা যাবে না, সেনিয়র। ফুয়েলের সমস্যা দেখা দেবে তাহলে। আমরা ফিরতে পারব না।'

হেলমেটের দিকে হাত বাড়াল ও। 'দিনারিক আলপসের দিকেই চলুন তাহলে, ওখানে কোথাও নেমে পড়ব।'

চোখ কপালে উঠল নেভিগেটরের। 'বলেন কি, সেনিয়র! সে তো গন্তব্য থেকে বেশ দূরে হয়ে যাবে। তাছাড়া ওর বেশিরভাগই ক্রোয়াটদের…'

'যাদেরই হোক, তাড়াতাড়ি করুন। নইলে আপনারা পালাবার সুযোগ পাবেন না। হারি আপ!'

'দু-দুটো ডট্!' ককপিট থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কো-পাইলট। 'স্ক্রীনে

দুটো ডট দেখা যাচ্ছে! ওরা আসছে!' শেষ দিকে আতঙ্কে গলা ভেঙে গেল তার।

'চেঁচিয়ো না!' ধমক লাগাল নেভিগেটর। 'মন্টেনিগ্রো, আলবেনিয়ার বর্ডার ঘুরে আসতে হবে ওদের, প্রচুর সময় পাব আমরা।' রানার দিকে ঘুরল সে। 'কি করব, সেনিয়র?'

'বুরুজ আলি!'

'জ্বে?'

'বন্ধুরা আসছে, তৈরি হও। এখনই জাম্প করতে হবে।' হেলমেট জায়গা মত বসিয়ে স্ট্র্যাপ এঁটে দিল রানা। পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে, আকাশ একটু একটু আলো হয়ে উঠেছে—চাঁদ উঠবে। নেভিগেটরের দিকে ফিরল। 'এখনই নেমে পড়ব আমরা। শুধু লক্ষ রাখবেন যেন সাগরে গিয়ে না পড়ি।'

'সি, সেনিয়র।' দরজা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। পাঁচ মিনিট পরই ফিরে এল আবার। ততক্ষণে ঘুরে গেছে পাথফাইন্ডার। 'সামনে একটা নিড়ল ইন্ডিকেট করছে রাডার। ওটা ক্রোয়েশিয়ান উপকূলীয় ছোট এক শহর ভ্রোগিরের সিটি স্কয়ারের মনুমেন্ট। ওখান থেকে বসনিয়ান বর্ডার খুব কাছে।'

মাথা দোলাল ও। 'উত্তর-পশ্চিমে।'

'সি।'

'অল রাইট। ওখানেই...'

'কিন্তু ক্রোয়াটরা যদি টের পায়?'

'কিছু করার নেই, পেলে পাবে। মিগগুলো কতদূরে?'

'তা অনেক। ওদের নিয়ে চিন্তা নেই, এগিয়ে আসছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের ঘুরে যেতে দেখে এতক্ষণে নিশ্চই হামলা চালানোর ইচ্ছে বাতিল করে দিয়েছে। সরি, সেনিয়র, ফুয়েল ক্যাপাসিটি আরেকটু বেশি হলে নিরাপদ কোন জায়গায় নামিয়ে দেয়া যেত আপনাদের।'

'দ্যাট'স ওকে, ম্যান। দরজা খুলুন।'

ওরা কেউ জানে না, পাথফাইন্ডারের উপস্থিতি এর মধ্যে অন্য দুই পক্ষ, ক্রোয়েশিয়ান ও বসনিয়ান বর্ডার রক্ষী বাহিনীও জেনে ফেলেছে। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে নিচে রীতিমত, যার যার উপকূলীয় সীমান্তে কড়া মানবপ্রাচীর তুলে দিয়েছে দু'পক্ষ।

খোলা দরজার দুই প্রান্ত আঁকড়ে ধরে দাঁড়াল রানা, বাতাসের তোড়ে প্রায় বুজে আছে চোখ। পিছনে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দানব, সিলিং নিচু বলে সোজা হতে পারছে না।

'বুরুজ আলি, রেডি?' মুখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল ও।

'জ্বে! দ্যান লাফ আল্লার নাম লইয়া।'

নেভিগেটরের দিকে তাকাল রানা। ককপিটের খোলা দরজায় এদিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, নজর রাডার স্ক্রীনে। কয়েক মুহূর্ত পর ঝট্ করে সামনে তাকাল। 'ভ্রোগিরের আউটস্কার্টে পৌঁছে গেছি আমরা, সেনিয়র!' বলেই বুড়ো আঙুল তুলল শূন্যে। 'জাম্প! গুড লাক...'

বাকিটুকু শোনা হলো না রানার, ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ঝোড়ো বাতাস। দুই হাঁটু

এক করে নিখুঁত ঝাঁপ দিল ও, ঠিক দু'সেকেন্ড পর বুরুজ আলিও। গোঁ-ওঁ-ওঁ আওয়াজ তুলে ছুটে গেল পাথফাইন্ডার, ডানে বাঁক নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চাঁদ ফুটতে শুরু করেছে, ঘোলা হলদেটে আলোয় মোটামুটি দেখা যায় কিছুদূর পর্যন্ত। প্রায় একই সাথে জোর ফড়াৎ! ফড়াৎ! শব্দে খুলে গেল ওদের প্যারাস্যুট, দু'হাতে দুই দড়ি ধরে নিজেকে স্থির করল রানা, উদ্বিগ্ন চোখে নিচের দিকে তাকাল। স্পষ্ট নয় কিছুই। ওপরে তাকাল, পুরো আকাশ ঢেকে রেখেছে প্যারাস্যুটের বিশাল ছাতা। দেখা যাচ্ছে না বুরুজ আলিকে।

আবার নিচের দিকে নজর দিল, বাঁ দিকে, বেশ খানিকটা দূরে বৈদ্যুতিক আলো দেখা যাচ্ছে—ওটাই ত্রোগির। এক মিনিটও পুরো হয়নি বোধহয়, সাঁৎ করে ছুটে এসে ওর পা স্পর্শ করল মাটি। এতই আচমকা ঘটল ব্যাপারটা যে আরেকটু হলে থুতনিতে হাঁটুর বাড়ি প্রায় খেয়েই বসছিল।

একেবারে শেষ মুহূর্তে টান মেরে মুখ সরিয়ে নিল ও। কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সামাল দিল নিজেকে। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হাতে প্যারাস্যুট গোটাতে শুরু করল। ঢালু, বিরাট এক ভুট্টার খেতে পড়েছে ওরা। দূরে কোথাও মোটা গলায় হেঁকে উঠল কেউ ক্রোটেন ভাষায়, পরক্ষণে আরেকটা হাঁক। একই সাথে কয়েকটা কুকুরের ভারী গলার পিলে চমকানো হুঙ্কার। চোখে নাইটগ্লাস ধরে সেদিকে তাকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে বুকের খাঁচায় দড়াম করে বাড়ি খেল হৃৎপিণ্ড লালচে ইমেজটা চোখে পড়তে।

ক্রোয়াট টেরিটোরিয়াল ডিফেন্স ফোর্স! সাত-আটজন জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘ দিনারিক আলপসের এক ছোট পাহাড়ের ঢালে। সবার নজর এদিকে। শেকলে বাঁধা ভয়ঙ্কর চেহারার চারটে হাউন্ড রয়েছে তাদের সাথে। কুকুরগুলো ভীষণ লাফ-ঝাঁপ করছে ছোটার জন্যে। বেশ দূরে রয়েছে ওরা।

পরিষ্কার বুঝল রানা ওরা কিছু একটা সন্দেহ করেছে। আলোর অভাবে নিশ্চই দেখতে পায়নি ওদের। পেলে দাঁড়িয়ে থাকত না। না কি দেখেই ফেলেছে? নিজের চারদিকে তাকিয়ে দেখল ও, যেটুকু আলো আছে, তাতে আকাশের পটভূমিতে প্যারাস্যুট দেখতে পাওয়ার কথা নয় বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হতে চাইল। কিন্তু পারল না। ওরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে কেন তাহলে? কুকুরগুলো ওরকম···

ধক্ করে উঠল বুক। আরও দূরের কোথাও থেকে আরেকটা মোটা গলার কম্যান্ড ভেসে এল। সাথে সাথে নড়ে উঠল দলটা। ঢাল বেয়ে এদিকেই ছুটে আসতে শুরু করেছে। টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে ওদেরকে হাউন্ডগুলো। ঘাড়ে রানার টোকা খেয়ে ঘুরল বুরুজ আলি। 'ওরা মনে হয় দেখে ফেলেছে আমাদের!' বলল ও। 'এখানে বসে থাকা নিরাপদ নয়। ওঠো।'

নীরবে মাথা দোলাল বুরুজ আলি।

কোমরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে ভুট্টা খেতের মধ্যে দিয়ে ছুটল ওরা পাশাপাশি। নিশ্চই এদের রাডারে ধরা পড়ে গিয়েছিল পাথফাইন্ডার, ভাবল রানা। এদের প্রস্তুতি দেখলে সেরকমই মনে হয়। সার্ব আর ক্রোয়াটদের মধ্যে বিশেষ তফাত নেই, দুটোই প্রায় সমান বৈরী বসনিয়ার। কায়দামত পেলে এরাও মুসলিম বাহিনীকে ছেড়ে কথা বলে না।

দলটা আসছে বাঁ দিক থেকে, আর ওরা ছুটছে কোনাকুনি, ডানদিকে। দুই দলের মাঝে, সোজা সামনে ত্রোগির। ওদিকে ক্রোয়াট টিডি ফোর্সের লোক সংখ্যা আরও বেড়েছে মনে হলো রানার, অনেকগুলো কণ্ঠের কম্যান্ড শোনা যাচ্ছে। খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ কি ভেবে থেমে পড়ল ও। 'টাউনের দিকে চলো।'

'হ্যা ক্যা?' বিস্মিত হলো বুরুজ আলি।

'যা খুঁজছি তা আছে কি না দেখেনি' আগে, তারপর বলব।'

ছুটল ওরা সোজা। গজ পঞ্চাশেক এগোতে টাউন স্কোয়্যারের মনুমেন্ট চোখে পড়ল, অনেকটা ক্লিওপেট্রার নিডলের মত দেখতে। বাড়িঘর সব অন্ধকারে ডুবে আছে। রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুর ছাড়া কিছু নেই। হঠাৎ পাথুরে রাস্তায় ধুলোর ঝড় তুলে একটা ট্রুপ ক্যারিয়ার ছুটে গেল ওদের সামনে দিয়ে আড়াআড়ি, বাঁ দিকে। অবশ্য বেশ দূর দিয়ে।

চাঁদের আলো স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখন। পিছনে মানুষ-কুকুর দুটোর সংখ্যাই অনেক বেড়েছে। তাদের সম্মিলিত হাঁক-ডাকে সরগরম হয়ে উঠেছে ফসলের মাঠ। দূরাগত একজোড়া জেট এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা এই সময়। নিশ্চয়ই সেই সার্ব জেট। অনেক দূর দিয়ে ঘুরে গেল আওয়াজটা, ক্রমে মিলিয়ে গেল একসময়। ওরা কি পাথফাইন্ডারের নাগাল পেয়েছে? ভাবল রানা, না বোধহয়। তাহলে গুলির শব্দ শোনা যেত।

একনাগাড়ে দৌড়ে প্রায় সিকি মাইল পেরিয়ে এসে থামল মাসুদ রানা, মাথা উঁচু করে পিছনে তাকাল। কারও দেখা নেই। গলা শোনা যায় মানুষের, উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচামেচি করছে, কিন্তু দেখা যায় না।

'ব্যাডাগো পাডার (পাঁঠা) বুদ্দি,' আপনমনে বলে উঠল বুরুজ আলি। 'কুত্তা ছাইর্‌রা দেলেই অয়, হেয়া দেবে না!'

'সে জন্যে ওদের তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল,' বলল রানা। 'কুকুর ছেড়ে দিলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেতাম আমরা।'

নিঃশব্দ হাসি ফুটল দানবের মুখে। মনে মনে বলল, জানামুহ্যানে ধইন্যবাদ, পাইয়ালই হাতের ধারে।

আরও তিন মিনিট দৌড়ে ত্রোগিরের প্রান্তে পৌঁছল ওরা। রাস্তায় ওঠার আগে এক ঝোপের আড়ালে বসে ভাল করে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। না, কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই—ঘুম বিভোর হয়ে আছে ত্রোগির। ঘরগুলো সব পাথরের, খাড়া মাটির টালি বসানো ছাত। ছিরিছাঁদ নেই কোন। ওগুলোর মধ্যে দেখতে মোটামুটি বড়, পরিচ্ছন্ন, এরকম তিনটে বাড়ি বাছাই করল রানা। প্রত্যেকটার সাথে আলাদা একটা করে ছাউনি আছে ওগুলোর— হয়তো গ্যারেজ।

নিচু কণ্ঠে বুরুজ আলিকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল ও। মাথা দোলাল সে। 'কিন্তু গারি দিয়া অইবে কি, যাওয়ার রাস্তা চেনা লাগবে না?'

'পুরো একটা দিন এ অঞ্চলের ম্যাপ গিলেছি,' জবাব দিল ও। 'আশা করছি চিনে নিতে পারব।'

আচমকা অনেকগুলো কণ্ঠ হৈ-হৈ করে উঠল এক সাথে। ওরা যেখানে পড়েছিল, মনে হলো সেখানেই জটলা করছে এখন টিডি ফোর্স। বেশ কয়েকটা

টর্চলাইটও জ্বলে উঠতে দেখা গেল।

'বুঝলে কিছু?' বলল রানা।

'প্যারাস্যুট খুইজ্জা পাইছে।'

আরেকবার পথের দু'দিকে চকিত নজর বুলিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো!'

রাস্তায় উঠে পড়ল ওরা, তারপর ঝুঁকে এক দৌড়ে ওপারের বাড়িঘরের ছায়ায় আশ্রয় নিল। না, কেউ চেঁচিয়ে উঠল না, ছুটেও এল না। তিন গ্যারেজ খুঁজে একটাই মাত্র গাড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু প্রথম দেখায় ওটা চলবে বলে ভরসা হলো না। সন্দেহ হলো ওটা বাতিল। হুড পরানো মিনি টর্চ জ্বেলে ভেতরটা ভাল করে দেখে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা—বাতিল মাল নয়। চালু। অচল হলে ভেতরে নিশ্চই ধুলোবালি জমে থাকত।

এক সমস্যা যেতে আরেক সমস্যা দেখা দিল। কারটা ধ্যাদ্ধেরে মার্কা সুপ্রাচীন এক ফরাসী সিট্রোঁ ইলেভেন সিভি। এই মডেল নির্মাণ শুরু হয় '৩৮ সালে, '৫৪ সালের পর এটা আর তৈরি করেনি কোম্পানি। চেহারা দেখে রানার ধারণা হলো এটা নির্ঘাত প্রটোটাইপ। এতই ছোট যে ভেতরে বুরুজ আলি ঢুকতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এবারও ওর সন্দেহ মিথ্যে প্রমাণ হলো।

নিজেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দলা পাকিয়ে ঠেসেঠুসে ড্রাইভারের পাশের আসনে তুলে ফেলল সে। তিন ভাঁজ হয়ে বেকায়দা আকার নিয়ে বসে থাকল মাথা নিচু করে। রানা উঠল এবার, স্লটে চাবি নেই, কাজেই ড্যাশবোর্ডের তলায় হাত ভরে সবগুলো তার টেনে আনল বাইরে। টর্চের আলোয় প্রয়োজনীয় তারগুলো আলাদা করল ব্যস্ত হাতে।

দূরে, মাঠের মধ্যে টিডি ফোর্সের কোলাহল অনেক বেড়ে গেছে, শুনতে পাচ্ছে ওরা স্পষ্ট। রীতিমত হাট বসিয়ে দিয়েছে ব্যাটারা। ক্রমেই এগিয়ে আসছে ওদের আওয়াজ। কুকুরের হুঙ্কারে পিলে চমকে চমকে ওঠে।

তিনটে তার বাছাই করে হ্যাঁচকা এক টানে ওগুলো ছিঁড়ে ফেলল রানা। ওর দুটো কালো, একটা লাল। একটা একটু মোটা। প্রথম তার দুটোর সাথে পরেরটা এক এক করে ছোঁয়াল ও, কথা ছিল ড্যাশ বোর্ডের আলো জ্বলে ওঠার, কিন্তু জ্বলল না।

ছ্যাৎ করে উঠল রানার বুক। ঘামতে শুরু করল, দ্রুত মাঠের ওপর দিয়ে এক চক্কর ঘুরে এল নজর। সর্বনাশ! গাড়িটা তাহলে অচল?

'কি অইলো?' চাপা গলায় বলল বুরুজ আলি। 'তরাতরি করেন!'

'দাঁড়াও, স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়ি!'

'অইছে কাম! এহন কেমন করবেন?'

শেষ চেষ্টা করল ও। চিকন তার দুটো জুড়ে লাল তারটা ঠেকাল তার সাথে, সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠল এক ঝলক রক্ত। কুঁই কুঁই শব্দে সাড়া দিল এঞ্জিন। একটু সময় দিল রানা, তারপর লাল তারটা আগের দুটোর সাথে দুই প্যাঁচে আটকে দিয়েই চোক ধরে টান মারল—ছোটখাট হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল সিট্রোঁ। ড্যাশবোর্ডের আলো যখন জ্বলেনি, তখন অন্য আলো জ্বলবে বলে মনে হলো না ওর, সে চেষ্টাও অবশ্য করল না। ঝট্ করে গিয়ার এনগেজ করেই ক্লাচ ছেড়ে দিল,

ঠেসে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। কামানের গোলার বেগে গ্যারেজ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল খুদে কার, রাস্তায় উঠে তীক্ষ্ণ এক বাঁক নিয়েই উত্তর-পশ্চিমমুখী রাস্তা ধরে খিঁচে দৌড় লাগাল লেজ দাবিয়ে।

ঠিক শুনেছে কি না কে জানে, শেষ মুহূর্তে ধাওয়াকারী লোকগুলো একযোগে চেঁচিয়ে উঠল বলে মনে হলো ওদের। দেখে ফেলেছে হয়তো। দেখুকগে, ভাবল রানা, বেশি দূরে নয় বর্ডার। একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে হয়।

'আমাগো দ্যাশে এই দৌরের দুইডা নাম আছে,' আপনমনে বলে উঠল বুরুজ আলি।

মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখল ও। 'কি কি?'

'খাইয়া না খাইয়া দৌর, আর আইজও দৌর কাইলও দৌর।' একটু চুপ করে থেকে যোগ করল, 'মুরহা (মুরগি) চোরে লইয়া গেছে, গেরস্থ এহনও হেয়া ট্যার পায় নাই।'

হাসি চাপল রানা। বেশ মুডেই আছে মানুষটা, একটুও ঘাবড়ায়নি বোঝা যাচ্ছে। 'বেশি আশা কোরো না,' গিয়ার বদল করে বলল ও। 'এখনও যদি টের না পেয়ে থাকে, গার্ড দল শহরে পৌঁছলেই পেয়ে যাবে। হৈ-চৈর শব্দে ঘুম ভেঙে গৃহস্থ যখন দেখবে গ্যারেজ ফাঁকা, যা বোঝার বুঝে নেবে ওরা।'

নীরব হয়ে গেল বুরুজ আলি। চাঁদের আলোয় পথ দেখে যথাসম্ভব দ্রুত গাড়ি ছোটাচ্ছে রানা। একেবারেই বাজে রাস্তা, খানাখন্দে ভর্তি, সেকেন্ডে সেকেন্ডে ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে ওরা। এর মধ্যেও গাড়ির মালিককে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেনি রানা। চেহারা-মডেল যাই হোক, গাড়ির যত্ন নেয় লোকটা। চমৎকার কাজ করছে এঞ্জিন, শব্দ প্রায় নেইই বলা চলে। ছুটছে তুমুল গতিতে। হেডলাইট নষ্ট না হলে আরও জোরে ছোটানো যেত।

তবে এ একদিক থেকে ভালই হয়েছে। আলো জ্বেলে চলতে গেলে প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কার মধ্যে থাকতে হত। অন্ধকারে গতি কম করে এগোতে হচ্ছে ঠিকই, তবে সে ভয় নেই।

সামনে ঝুঁকে মাথা প্রায় উইন্ডশীল্ডে ঠেকিয়ে রেখেছে রানা পথ দেখার সুবিধের জন্যে। প্রতিটি ঝাঁকিতে হুইলে বাড়ি খাচ্ছে থুতনি, শীল্ডে ঠুকে যাচ্ছে কপাল, পরোয়া নেই। বেশ কিছুক্ষণ নিরাপদেই এগোল ওরা। দিনারিক আলপসের আঁকাবাঁকা, পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে সোজা উত্তর-পশ্চিমে। বাঁয়ে যতদূর চোখ যায় পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে মাঝে টর্চের আলোয় ম্যাপ দেখে পথের নির্দেশ জানাচ্ছে রানাকে বুরুজ আলি।

বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেল। বাধা এল না কোনদিক থেকে। ফাঁড়া হয়তো কেটেছে ভেবে খুশিমনে ফাঁকা বুকটা ভরার জন্যে সিগারেট ধরাবার আয়োজন শুরু করল রানা, এবং জমে গেল বুরুজ আলির মন্তব্যটা শুনে।

'রানা ভাই!' জানালা দিয়ে আলোকিত আকাশ দেখার চেষ্টা করছে সে। 'পেলেনের আওয়াজ!' বলে উঠল রুদ্ধশ্বাসে। 'জেট পেলেন!'

তিন

কান ফাটানো বিকট গর্জনের সাথে মুহূর্তে মাথার ওপর পৌঁছে গেল চকচকে, ভীতিকর কাঠামোটা। এতই নিচ দিয়ে উড়ে গেল, ভয় হলো আরেকটু হলে বুঝি সিট্রোর ছাতে ঘষা খেত ওটার পেট। এমন আকস্মিক দ্রুততার সাথে হাজির হলো ওটা যে রীতিমত থতমত খেয়ে গেল মাসুদ রানা।

মাথার ওপর দিয়ে পাক খেয়ে উড়ে যাওয়ার সময় পাইলটের মুখটা অস্পষ্ট দেখতে পেল দু'জনেই। তার মুখের সামনে মাউথপীস ধরে রাখা স্টীলের দণ্ড ঝিকিয়ে উঠল চাঁদের আলোয়। পুরো পর্বতমালা কাঁপিয়ে উল্টোদিকে ছুটে গেল প্লেনটা। কিছুই করল না প্রথমবার।

থাবা দিয়ে পিছনের সীট থেকে নিজের স্টেন তুলে নিল বুরুজ আলি। বাঁ হাতের মস্ত থাবায় ধরে জানালা দিয়ে বের করে দিল ওটা। ঘটনার আকস্মিকতায় গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল রানা, হুঁশ হতে তাড়াতাড়ি অ্যাক্সিলারেটর দাবিয়ে ধরল, চিতার মত লাফ দিল সিট্রো।

'শক্ত হয়ে বোসো,' বলল রানা।

'বইছি।' মাথা বের করে প্লেন কতদূর গেল দেখছে সে, চেহারায় চিন্তার ছাপ।

সামনে মন দিল ও, গতি ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে, হাঁ-হাঁ করে তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত জানপ্রাণ বাজি রেখে ছুটছে ইলেভেন সিভি। উঁচু-নিচু রাস্তায় দড়াম দড়াম বাড়ি খাচ্ছে ফ্রন্ট অ্যাক্সেল, বাড়ি খেয়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে সামনের দিক, কিছুদূর নাক তুলে পিছনের দুই সরু টায়ারের ওপর ভর দিয়ে ছুটছে, তারপর সজোরে আছড়ে পড়ছে। প্রত্যেকটা আছাড়ে ঘিলু পর্যন্ত নড়ে উঠছে ওদের।

কয়েক সেকেন্ড পর পর জানালার ফ্রেমে মাথা ঠুকে যাওয়া, তালুতে ছাতের বাড়ি এবং পরস্পরের মাথায় মাথায় সংঘর্ষ নিয়মিত ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যাওয়া ছাড়া করার নেই কিছু। ভেতরে জায়গা এতই অল্প যে একজন আরেক-জনের সাথে সেঁটে আছে ওরা, আঘাত এড়ানো সম্ভবই নয়।

'আর কদ্দূর, রানা ভাই?' কানের পাশে আঘাত পাওয়া জায়গা ডলতে ডলতে বলল বুরুজ আলি। আঙুল ভেজা ভেজা লাগছে। কেটে গেছে চামড়া।

'তিন-চার মাইলের মত,' হুইলের সাথে কুস্তি করতে করতে বলল ও।

'গারি ফালাইয়া গেলে অইতে না?'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা, তখনই বাঁ দিক থেকে একসাথে গর্জে উঠল তিন-চারটে রাইফেল। নিজেদের পাহাড়ের অবস্থান থেকে গুলি ছুঁড়ছে ক্রোয়াট গার্ড বাহিনী। একটা বুলেটও ধারেকাছে এলো না, কোনদিক গেল, তাও অবশ্য বোঝা গেল না।

'থাউক তয়। নাইম্মা কাম নাই।'

মনে মনে হাসল রানা। এই আশঙ্কার কথাটাই জানাতে যাচ্ছিল ও বুরুজ

আলিকে। গাড়ি ছাড়লে বিপদ কমবে না, বরং বাড়বে। এখন সামাল দিতে হচ্ছে একটাকে, তখন কে জানে...

ফিরে আসছে জেট। সেকেন্ডে সেকেন্ডে বাড়ছে তীব্র গর্জন, কানে তালা লেগে গেল ওদের। আগেরবার ভালমত লক্ষ করার সুযোগ হয়নি ওটাকে রানার, এবার হলো। দেখামাত্র চিনে ফেলল—ওটা এফ এইটিসিক্স, স্যাবর জেট। মাসুদ রানার খুব ভাল পরিচয় আছে এর সাথে, স্যাবর নিয়ে আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। *এখনও এরা এই মাল ব্যবহার করে দেখে একটু অবাকই হলো ও।*

কিন্তু ভাবনা-চিন্তার পিছনে বাড়তি এক মুহূর্তও নষ্ট করার সময় নেই এখন, এসে পড়েছে মৃত্যুদূত। সরাসরি সামনে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ধেয়ে আসছে, চোখের পলকে এসে পড়ল, শেষ মুহূর্তে এতবড় লাগল ওটাকে যে রানার মনে হলো বুঝি ওদেরসহ আস্ত গাড়িটাই গিলে খেয়ে ফেলবে।

পুরানো অভিজ্ঞতাই সঠিক সময় বলে দিল, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'সাবধান! ব্রেক করছি আমি!' বলেই গায়ের জোরে ব্রেক পেডাল ঠেসে ধরল। সময় থাকতে থাবা দিয়ে ডান হাতে ড্যাশবোর্ড ধরে ফেলল বুরুজ আলি, বাঁ হাতে ধরা স্টেন গর্জে উঠল প্রায় একই মুহূর্তে। স্যাবরের চারটে পয়েন্ট ফাইভ-ও হেভি মেশিনগানের মায্লও ঝল্সে উঠল, যদিও জেট এঞ্জিনের দুনিয়া ফাটানো গর্জনের তলে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল ওগুলোর আওয়াজ।

ততক্ষণে প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে সিট্রো, সামনের রাস্তায়, ওটার নাকের মাত্র কয়েক গজ দূর দিয়ে তেরছাভাবে ধুলো উড়িয়ে ছুটে গেল এক ঝাঁক হেভি ক্যালিবার বুলেট। একটাও লাগল না গাড়িতে। মুহূর্তে ওদের টপকে হাওয়া হয়ে গেল স্যাবর, বুরুজ আলির গুলিতে কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হলো না। লাগেনি হয়তো।

আবার গাড়ি ছোটাল রানা। পরিশ্রম আর উত্তেজনায় ঘেমে গোসল হয়ে গেছে এর মধ্যে। রাস্তা ছেড়ে সরে যাওয়ার উপায় নেই এখন। বাঁ দিকে পাহাড়-পর্বতে অস্ত্র তাক্ করে বসে আছে টিডি গার্ড-বাহিনী, ডানদিকে প্রকাণ্ড সব বোল্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে পথ আগলে বসে আছে। তাছাড়া ওদিকের পাথুরে জমি ক্রমশ উঠে গেছে ওপরদিকে, মিশেছে গিয়ে আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড সব গাছ-গাছালির বিশাল এক বনের পায়ের কাছে। কালিগোলা অন্ধকারে ডুবে আছে ওদিকটা। কাজেই ওদিকে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। মরতে হলে অন্ধকারে নয়, খোলা জায়গায় মরতে চায় মাসুদ রানা।

প্রকাণ্ড এক বোল্ডারের সাথে ঘষা খেল দ্রুত ধাবমান সিট্রোর পিছনটা, ঝাঁকির চোটে ভীষণ জোরে ঠুকে গেল দু'জনের মাথা। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে নিল ওরা। সামলে উঠতে না উঠতে পথের মাঝের এক গর্ত পাশ কাটাতে গিয়ে পড়ে থাকা আরেকটার ওপর কাৎ হয়ে চড়ে বসল কার, গোটা এগজস্ট পাইপ ছিঁড়েখুঁড়ে খসে পড়ে থাকল ওখানেই। দেখতে দেখতে ভেতরটা ধোঁয়ায় ভরে উঠল। প্রবলবেগে কাঁপছে সিট্রো, এত আওয়াজ করে কোঁকাচ্ছে যে ভয় হয় সমস্ত কল-কব্জা, নাট বল্টু অজান্তেই খুলে খুলে পড়ছে বুঝি।

ভাল করে তৈরি হওয়ার সুযোগ দিল না ওদের স্যাবর, এসে পড়ল আবার।

সামনে ঝুঁকে ওপরে তাকাল রানা, ছুটে আসছে জেট, চাঁদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে ফিউজিলাজ। সময়মত এবারও ব্রেক কষল ও। মাথার ওপর ঝল্সে উঠল হেভি মেশিনগান, বুরুজ আলির স্টেনও তার জবাব দিল। ওর বুলেট কিছু করতে পেরেছে বলে মনে হলো না এবারও, তবে সিট্রোর দেহে বিঁধেছে কয়েকটা। উইন্ডশীল্ড চুরমার করে দিল একটা হেভি ক্যালিবার বুলেট।

কাঁচের টুকরো ছুটে এসে লাগল ওদের নাকেমুখে। থুত্নি কেটে রক্ত গড়াতে শুরু করল রানার। কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই, দ্রুত বিলীয়মান স্যাবরের পাইলট আর তার পূর্ব-পুরুষদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে ও, সাথে নিজেকেও উদ্ধার করছে। কারণ এবার ব্রেক করতে চুল পরিমাণ দেরি করে ফেলেছে রানা, এই জন্যেই ঘটল বিপত্তি। আরেকটু হলে ওদেরকেই হজম করতে হত তপ্ত সীসা।

ব্যস্ত হাতে শূন্য ম্যাগাজিন ফেলে নতুন একটা ভরল বুরুজ আলি। খেপে গেছে। ডানদিকে একটা সাইড রোড চোখে পড়তে আচমকা গাড়ি ঘুরিয়ে দিল রানা, উঠে পড়ল সেটায়। পাকা নয়, শক্ত পাথুরে মাটির পথ। ভীষণ আঁকাবাঁকা। তার ওপর মোষে টানা গাড়ির চাকার বেশ গভীর দাগ। ওর মধ্যে খাপে খাপে বসে পড়েছে সিট্রোর চাকা। এমন বসাই বসেছে, রানাকে কষ্ট করে হুইল ঘোরাতে হচ্ছে না আর, রাস্তাই সে কাজ করে দিচ্ছে।

কিন্তু এর ফলে যোগ হয়েছে আরেক যন্ত্রণা। গাড়িটা এমনিতেই নিচু, তারওপর চাকা বসে যাওয়ায় দুই ট্র্যাকের মাঝের উঁচু জায়গায় ক্রমাগত ঘষা খাচ্ছে এখন গাড়ির তলপেট। ওদিকে এগজস্ট পাইপ না থাকায় এত কর্কশ আর জোরাল আওয়াজ করছে এঞ্জিন, মনে হচ্ছে জেট এঞ্জিনের আওয়াজও বুঝি এত কানে লাগে না। শব্দের অসহ্য অত্যাচারে নিজেদের চিন্তাভাবনাও শুনতে পাচ্ছে না ওরা।

আবার ছুটে আসছে স্যাবর জেট। ওটার রাডারে একটা ছোট্ট ফোঁটার মত অনবরত টিপ্ টিপ্ করছে নিচের ধাতব পোকাটা, কাজেই চোখে না দেখলেও জায়গামত পৌঁছতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি পাইলটকে। পরস্পরের দিকে তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে স্যাবর ও সিট্রো। উইন্ডশীল্ড ভেঙে যাওয়ায় সুবিধেই হয়েছে বুরুজ আলির, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ধরে রেখেছে সে স্টেন। তীব্র বাতাসে দু'জনেরই দৃষ্টি সঙ্কুচিত, খুলি কামড়ে ধরে আছে চুল।

আকৃতি বড় হতে হতে আচমকা এতই বড় হয়ে উঠল স্যাবরের, মনে হলো এখনই ওটার বিশাল এয়ার স্কুপের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে ওরা গাড়িসহ। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা ব্রেকের ওপর, দু'হাতে হুইল ধরে দাঁতমুখ খিঁচে রেখেছে। কিছুটা গাড়ির আচমকা ব্রেক কষার তোড়ে, কিছু নিজের ইচ্ছেয় মাথা-কাঁধ উইন্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে বের করে দিয়েই ট্রিগার টেনে ধরল বুরুজ আলি। রানা ব্রেক কষল, খানিকটা স্কিড্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল কার।

প্রায় একই মুহূর্তে স্যাবরের পয়েন্ট ফাইভ ও-র মায্লে আগুনের তীব্র ঝল্কানি দেখা গেল। এবার সময়মত ব্রেক করা হয়েছে বলে সুবিধে করতে পারল না স্যাবর, প্রায় সমস্ত বুলেট রাস্তায় পড়ল, পাথরের ছোট-বড় টুকরো, শক্ত মাটির ঢেলা বোলতার মত গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল আশপাশ দিয়ে।

তবে মাটির রাস্তা বলে অন্যান্য বারের মত প্রায় জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়তে ব্যর্থ

হলো এবার ওরা, কয়েক ফুট এগিয়ে গেল স্কিড্ করে, ফলে একটা বুলেট বিঁধেছে বডিতে। সিট্রোর নাক থেকে বাষ্প উড়তে দেখে বোঝা গেল ভাল জায়গাতেই বিঁধেছে— রেডিয়েটরে। হেঁচকি তুলে হিস্স্ আওয়াজের সাথে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ফুটন্ত পানি, ছিট্কে এসে পড়ল ওদের নাকে মুখে।

গিয়ার দিল মাসুদ রানা, ছুটল আবার পড়িমরি। এঞ্জিনের ফট্-ফট্ বিকট আওয়াজে কান পাতা দায়। তারওপর ভাঙা উইন্ডশীল্ড দিয়ে তীব্র বাতাসের সাথে ভেসে আসা ধুলোবালির জ্বালায় চোখ মেলে রাখা হয়েছে আরেক মহা সমস্যা। প্রায় অন্ধের মত ছোটাতে হচ্ছে গাড়ি।

মরিয়া হয়ে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে লাগল ও। জানে এভাবে বেশিক্ষণ টেকা সম্ভব হবে না। এখন-তখন যখনই হোক, ওর ফাঁদেই ওকে ফেলবে পাইলট। ওরা এখনও যে বেঁচে আছে, সে কেবল রানার স্যাবর জেটের ব্যাপারে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে বলেই। ও জানে, ওগুলোর হেভি মেশিনগানের ক্ষমতা খুবই সীমিত। টানা ত্রিশ সেকেন্ড ট্রিগার টেনে রাখলেই শেষ হয়ে যায় ম্যাগাজিন।

কাজেই পাইলট দুই কি বড়জোর তিন সেকেন্ডের বেশি সময় ট্রিগার চেপে রাখার ঝুঁকি নিচ্ছে না। ইচ্ছে থাকলেও পর্যাপ্ত বুলেট ছুঁড়তে পারছে না সে, ঘায়েল করতে পারছে না ওদের।

তারচেয়েও বড় অসুবিধের কারণ হচ্ছে স্যাবরের নিজের ব্যালান্স। মাথা নিচু অবস্থায় গুলি ছোঁড়ার সময় চার-চারটে হেভি ক্যালিবার মেশিনগানের ওজন এবং রিকয়েলের ধাক্কায় আরও নিচু হয়ে যায় নাক, সব সময়ই টার্গেটকে তাই আন্ডারশূট করার একটা প্রবণতা থাকে ওগুলোর। অভিজ্ঞ ক্রোয়াট পাইলট যখনই আক্রমণ করছে, সে কথা মনে রেখে গুলি ছুঁড়ছে সিট্রো যেখানে রয়েছে, তার এক চুল আগে, যেখানে মুহূর্ত পরই ওটার পৌঁছার কথা। এবং প্রতিবারই রানা ওটার এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে। কিন্তু এভাবে আর কতবার ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে?

একবার, কি দু'বার। এর বেশি সুযোগ দেবে না সে ওদের। মাসুদ রানার চালাকি ধরে ফেলেছে লোকটা, হয়তো এবারই খতম করে দেবে সব ঝামেলা, ট্রিগার টানার আগে চুল পরিমাণ এগিয়ে আসবে। সমস্ত লীলা-খেলা সাঙ্গ করে হাসিমুখে ফিরে যাবে বেজে।

আওয়াজ দ্রুত কাছিয়ে আসছে প্লেনের, এসে পড়েছে, তৈরি হতে যাচ্ছিল রানা, আচমকা আপনাআপনি ডানে ঘুরে গেল গাড়ি ঘষা খেতে খেতে, নাচতে নাচতে। বনের কিনারা ঘেঁষে ডানে ঘুরে গেছে রাস্তাটা, কোনদিকে কে জানে! সামান্য দূরেই আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা। অন্ধকার হয়ে আছে চারদিক।

জায়গাটা প্লেনের জন্যে বিপজ্জনক, তাই শেষ মুহূর্তে নাক তুলে সাঁ করে ওপরে উঠে গেল পাইলট তির্যক এক রেখা ধরে, হারিয়ে গেল জেট গাছের আড়ালে। রানা ঢুকে পড়ল অন্ধকারের রাজত্বে।

একটু পর খেয়াল হলো বুরুজ আলি ঘন ঘন নড়াচড়া করছে। বারবার টর্চলাইট জ্বেলে কি যেন দেখছে। আড়চোখে তাকে দেখার চেষ্টা করল রানা। 'কি হয়েছে?' জানতে চাইল বিরক্ত কণ্ঠে।

'এই জায়গায় এট্টু জিরাইয়া নেলে অইতে না?'
'কেন?'
'আমনের হারা গালে-কপালে রক্ত। সার্জিকাল পেলাস্টার লাগাইয়া দেতে চাইছেলাম।'
'ধন্যবাদ,' হাসল ও। 'এখানে থামলে শুধু প্লাস্টারে হবে না, দুটো কফিনও প্রয়োজন হবে। চারদিক থেকে বর্ডার গার্ড বাহিনী ঘিরে ফেলবে আমাদের, বুঝলে?'
'হ। হেয়াও তো একটা কতা।' কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলে উঠল সে আপনমনে, 'এডা কোন কাম্ অইলে?'
'কিসের কথা বলছ?'
স্টেনটা ঝাঁকাল সে। 'এতগুলা গুলির একটাও লাগাইতে পারলাম না হালার গায়ে!' আফসোস ফুটল বলার সুরে।
'কি করে বুঝলে লাগেনি? নিশ্চই লেগেছে! এত কাছ থেকে ছোঁড়া ব্রাশ ফায়ার থেকে এক-আধটা না লেগেই পারে না।'
বেশ উদ্দীপ্ত হলো যেন দানব। 'আমিও তো হেইয়াই কই,' প্রকাণ্ড মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, 'দুই-একটা না লাইগ্যাই পারে না।'
মাথার ওপর স্যাবর জেটের গর্জন শোনা যাচ্ছে, ঘুরছে ওটা। অপেক্ষায় আছে বেয়াড়া সিট্রোর খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসার। হুইলের ওপর ঝুঁকে বসে আছে রানা, ডাল-পালার ফাঁক দিয়ে আসা অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় পথ দেখে চলার চেষ্টা করছে। শুধু ধরেই আছে হুইল, ট্রেইলের সাথে তাল রেখে চাকা আপনাআপনিই ঘুরছে বলতে গেলে।
মিনিট পাঁচেক চলার পর খানিকটা সামনে আলোর বিস্তৃতি দেখে বোঝা গেল বন শেষ হয়ে আসছে। মনে মনে তৈরি হলো রানা। খোলা জায়গায় পড়তেই সামনে পর পর কয়েকটা চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ বাঁক চোখে পড়ল। রাস্তাও অনেক সরু এখানে, চেপে এসেছে দু'পাশ থেকে। ভয় হলো, সামনেই হয়তো আচমকা কোথাও দেখা যাবে শেষ হয়ে গেছে রাস্তা—এগোবার উপায় নেই আর।
বাজে চিন্তাটা মন থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিল ও। খানিকটা এগোতেই বাঁ দিকে আবার দেখা দিল দিনারিক আলপস। সেদিকে সতর্ক নজর রেখে প্রথম বাঁকটা অতিক্রম করল, দ্বিতীয়টাও। তখনই কাশতে শুরু করল এঞ্জিন। পানির অভাবে গনগনে আগুনের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে প্রতিটা পার্টস, নাকেমুখে গরম বাতাসের ঝাপ্টা লাগছে। কমে আসতে শুরু করেছে সিট্রোর গতি, তবে ভাগ্য ভাল যে রাস্তা এখানে ঢালু, আপনা থেকেই গড়াচ্ছে চাকা। গতি অবশ্য আগের থেকে কম।
তৃতীয় বাঁকের মুখে সবে পৌঁছেছে ওরা, আচমকা নীরবতা খান্ খান্ করে দিয়ে বাঁ দিক থেকে একযোগে গর্জে উঠল কয়েকটা অটোম্যাটিক রাইফেল। তিন-চারটে বুলেট বিঁধল সিট্রোর নরম দেহে, টান মেরে খাবলা খাবলা স্টীল ছিঁড়ে নিয়ে গেল। চমকে উঠল দু'জনেই, ঝট্ করে স্টেন বের করে দিল বুরুজ আলি জানালা দিয়ে। ঠিক কোনদিক থেকে এসেছে বুলেট বুঝতে পারেনি, তাই অপেক্ষায় থাকল দ্বিতীয় দফা মায্‌ল ফ্ল্যাশের।

আবার গুলি হলো, তবে উল্টোদিক এবং বেশ ওপর থেকে। রানার দিকের জানালার কাঁচ চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, পরক্ষণে আরেক বুলেট সেঁধিয়ে গেল ওর সীটের গদিমোড়া ব্যাকে। আঁতকে উঠে অ্যাক্সিলারেটর ঠেসে ধরল রানা, বাঁক নেয়া শেষ করে গোঙাতে গোঙাতে এগোল সিট্রো।

গাড়ি ছেড়ে নেমে যেতে পারলে ভাল হত, ভাবল ও, কিন্তু এ মুহূর্তে তা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। কোথায় রয়েছে শত্রু, কতজন, কে বলতে পারে? গাড়ি ছেড়ে এই অচেনা জায়গায় কোথায় লুকোবে ওরা?

ভাবতে ভাবতে শেষ বাঁক ঘোরা শেষ করল। যেমন আচমকা ঢুকে পড়েছিল বনের পথে, তেমনি করে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। একেবারে ফাঁকা চারদিক। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। এগোবে, না কি করবে ভাবছে রানা, এই সময় পিছন থেকে আবার ছুটে এল এক ঝাঁক গুলি।

দ্বিধা কাটিয়ে গতি বাড়াল ও সিট্রোর। আশ্চর্য! সাড়া দিল এঞ্জিন, লাফাতে লাফাতে ছুটল সামনের দিকে। তখনই জেটের জোরাল গর্জনের আওয়াজ এল কানে। ওদের দেখতে পেয়েছে নিশ্চই ওটা—আসছে!

ক্রমেই বাড়ছে আওয়াজ। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা একভাবে, কখন আসে সেই প্রতীক্ষায়। আওয়াজ বহুগুণ বেড়েছে অথচ দেখা নেই স্যাবরের। এর মানে কি? ভাবল রানা। একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরতে পারল নিজের গাধামিটা। সামনে থেকে নয়, পিছন থেকে আসছে এবার ওটা, একেবারে ঘাড়ের ওপর পৌঁছে গেছে। শেষ মুহূর্তে ভাঙা রিয়ার ভিউ মিররে উড়ন্ত দানবটাকে দেখতে পেল রানা, পুরো মিরর জুড়ে আছে ওটা অশুভ এক ছায়ার মত।

মুহূর্তের ভগ্নাংশের জন্যে জমে থাকল ও, পরক্ষণে সাড়া দিল আতঙ্কে জমে যাওয়া ব্রেন। আগের টেকনিকই একটু অন্যভাবে খাটাল। অন্যদিকে মন রেখে চালাতে গিয়ে অজান্তে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল গাড়ি, একেবারে চরম মুহূর্তে দাবিয়ে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। আচমকা সামনে ঝাঁপ দিল ওটা। কিন্তু শেষ রক্ষা করা গেল না, স্টীল জ্যাকেট পরা এক ঝাঁক বুলেট ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল সিট্রোকে। ঠিক ওটার মাঝ বরাবর দীর্ঘ এক লাইন গুলির স্থায়ী দাগ রেখে সগর্জনে উড়ে গেল স্যাবর। দাগটা সামান্য ডানে অথবা বাঁয়ে সরলেই ওদের যে কোন একজনের নিশ্চিত মৃত্যু হত।

ভেতরের ড্যাশ প্যানেল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, বনেটের ভেতর কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্টসেও গুলি লেগেছে বোঝা গেল হাঁটুতে আগুনের উত্তাপ লাগতে। প্যানেলের তলায়, ভেতরে কোথাও আগুন ধরে গেছে। তেলতেলে ধোঁয়ার ঘন মেঘ পলকে ঘিরে ধরল ওদের, আঁধার হয়ে গেল চারদিক। বাঁ দিকের ফ্রন্ট অ্যাক্সেল শেষ, পেট্রল গড়িয়ে পড়ছে ফুটো হয়ে যাওয়া ট্যাঙ্ক থেকে। এঞ্জিন ব্লকের আগুন মুহূর্তে টায়ার ধরে ফেলল, ওদিকে স্পিডোমিটারও খতম।

সব মিলিয়ে অন্তিম অবস্থা—মারা যাচ্ছে সিট্রো ইলেভেন সিভি, তবু থামার নাম নেই। টায়ার-টিউববিহীন স্রেফ রিমের ওপর ভর করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটছে ওটা জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত। ধাতব দেহ যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। হঠাৎ ট্রেইলের মাঝে পড়ে থাকা শক্ত কিছুর সাথে জোরে ঠুকে গেল রিম, গর্ত ছেড়ে এক লাফে উঠে

পড়ল গাড়ি, আপনাআপনি ডানে ঘুরে গেছে। নেমে যেতে শুরু করেছে ঢাল বেয়ে। সামনেই খাড়া ক্লিফ। ওটা অবশ্য দেখতে পায়নি ওরা। ওদিকে তখন চক্কর শেষ করেছে স্যাবর। এখনই চড়াও হবে এসে নতুন উদ্যমে।

আচমকা গাড়ির গতি বেড়ে যাওয়ায় সতর্ক হলো রানা। বিপদের গন্ধ পেল। দরজার হাতল ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'লাফ দাও! বুরুজ আলি, লাফ দাও!'

প্রায় একই সাথে দু'দিকের দরজা খুলে ফেলল ওরা। নিতান্তই সৌভাগ্য বলতে হবে যে সিট্রোর এই বিশেষ মডেলটির দরজার হিঞ্জ পিছনদিকে, দরজা খোলেও উল্টোদিকে। সেটাই বাঁচিয়ে দিল ওদের অল্পের জন্যে। দুই দরজা একসাথে হাঁ হয়ে খুলে যাওয়ায় বাতাসের চাপে কারের গতি অনেকটা রুদ্ধ হলো মুহূর্তের জন্যে, সেই সুযোগে পাথুরে মাটিতে কাঁধ দিয়ে আছড়ে পড়ল রানা ও বুরুজ আলি।

এক সেকেন্ড মাত্র, তারপরই ওদের হতবিহ্বল চোখের সামনে লাফ দিল সিট্রো, নাক নিচু করে ক্লিফের কিনারা গলে গড়িয়ে পড়ল, রওনা হয়ে গেল অনেক নিচের খাদের উদ্দেশে। আহাম্মকের মত একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। হুঁশ হলো নিচে কিছু একটার ওপর সিট্রোর সজোরে আছড়ে পড়ার বিকট আওয়াজে।

হামা দিয়ে এগিয়ে উঁকি দিল দু'জনে। দেখা গেল পাহাড়ের ফুলে থাকা এক অংশে বাড়ি খেয়েছে কার, ছিটকে পথ থেকে সরে গেছে হাত দশেক। শূন্যে দুটো ডিগবাজি খেয়ে আবার সবেগে নামতে শুরু করল, বড় বড় কয়েকটা গাছের ওপর পড়ায় আরেকবার গতি ধীর হলো কিছুটা, এরপর অসংখ্য ডালপালা ভেঙে সাথে নিয়ে চলল সিট্রো।

বেশ কিছু সময় পর ওটার ফাইন্যাল পতনের আওয়াজ এল। পাথুরে ক্যানিয়নের মেঝেতে আছড়ে পড়ামাত্র বিস্ফোরিত হলো ফুলঝুরির মত, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

একই সময় ওপর দিয়ে বিকট গর্জন তুলে ছুটে গেল স্যাবর। আগুন নিশ্চই চোখে পড়েছে পাইলটের, তবে আরোহীদের পরিণতি সম্পর্কে হয়তো জানে না কিছু। সে কি ধরে নেবে গাড়ির সাথে আরোহীরাও শেষ হয়ে গেছে? চিন্তাটা মনে জাগতেই আশান্বিত হয়ে উঠল রানা। ওটা কি ফিরে যাবে এখন?

ভাবনাটা শেষ করার সুযোগ পেল না ও, পর্বতমালা কাঁপিয়ে পিছন থেকে এক সাথে গর্জে উঠল তিন-চারটে অটো রাইফেল। একটা বুলেট বুরুজ আলির খুব কাছের এক বোল্ডারে লেগে ছিটকে চলে গেল আরেকদিকে। চট্ করে শুয়ে পড়ল ওরা। ঘুরে তাকাল। দেখা যায় না কাউকে।

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল দানব। পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'ভা-রী জ্বালান জ্বালাইয়া লইছে তো হালারা!'

'ওরা আমাদের লাফিয়ে পড়তে দেখেছে গাড়ি থেকে,' আনমনে বলল রানা। 'জানে আমরা এখনও মরিনি।'

হাতের স্টেনের নল দিয়ে গাল চুলকাল বুরুজ আলি। এর মধ্যেও ওটা হাতছাড়া করেনি সে। রানা তাকিয়ে আছে পিছনের ঘন বনের দিকে। একবার ওর

মধ্যে ঢুকতে পারলে হত, ভাবছে ও। যদিও ভাবনাটা বিন্দুমাত্র স্বস্তি দিতে তো পারলই না, উল্টে বরং অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

ও জানে, বিপদ ওখানেও ওঁৎ পেতে বসে আছে। তবু যেতে হবে। না গিয়ে উপায় নেই।

চার

দূর থেকে ক্রোটেন ভাষায় বাজখাঁই কমান্ড ভেসে এল, তার সাথে বেশ কয়েকটা কণ্ঠের উত্তেজিত কথাবার্তা। পথের শেষ বাঁকটা যেখানে, মনে হলো সেখান থেকে আসছে আওয়াজ, ওদের বড়জোর তিন-চারশো গজ দূরে জায়গাটা। গুলিও ওদিক থেকেই এসেছে ধরে নিল রানা। বিপদের কথা। তবে জায়গাটা ওদের অবস্থানের চেয়ে বেশ উঁচুতে, কেউ এগোতে চাইলে তাকে দেখতে পাবে ওরা, সে ভরসাও আছে।

রুমাল বের করে চেপে চেপে ঘাড়ের-চিবুকের রক্ত মুছল ও। অনেক জায়গা কেটে চিরে গেছে। সেই তুলনায় বুরুজ আলির বলতে গেলে কিছুই হয়নি। তার অস্ফুট ডাক শুনে ঘুরে তাকাল রানা, হাত তুলে আকাশ দেখাল সে ওকে।

ছোট এক খণ্ড মেঘ দেখাচ্ছে বুরুজ আলি। ধীর গতিতে চাঁদের দিকে ভেসে আসছে, পৌঁছে যাবে মিনিটখানেকের মধ্যে। ইঙ্গিতটা বুঝল রানা—চাঁদকে যদি মিস্ না করে মেঘ, তাহলে ছায়াটা কাজে লাগাবার কথা বলতে চাইছে সে। মাথা ঝাঁকাল ও।

খাপে পোরা কমান্ডো ছুরিটার স্পর্শ নিল। ওর স্টেন গেছে সিট্রোর সাথে, এখন ভরসা এই ছুরি আর ওয়ালথার। কয়েকটা গ্রেনেডও অবশ্য আছে। বুরুজ আলিরটা লাফ দেয়ার সময় ওর হাতেই ছিল। ছাড়েনি।

দূরে কোথাও তিন-চারটে কুকুর ডাকছে। মাথা তুলে চারদিকে তাকাল রানা। কোথাও নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। তবে গলা শোনা যাচ্ছে। বেশ সাড়া পড়ে গেছে গার্ড বাহিনীর মধ্যে, বোঝাই যায়। আবার একটা হাঁক শোনা গেল—সবাইকে এগোতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। যে করে হোক, আটক করতে বলা হচ্ছে ওদের। ভাব-চক্কর সুবিধের নয়। রানার মনে হলো এ গেরো থেকে বের হওয়া কঠিন হবে।

এক সাথে আকাশের দিকে তাকাল ওরা। চাঁদের অনেক কাছে এসে পড়েছে মেঘ, দশ-পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ঢেকে ফেলবে ওটাকে। হাত তুলে শ'দেড়েক গজ পিছনে ফেলে আসা রাস্তার ওপাশের গাছপালা দেখাল ও। রাস্তার পর খানিকটা পতিত জমি পার হলেই বন। ছোট-বড় অসংখ্য বোল্ডার পড়ে আছে জমিতে। ফাঁকাটুকু একবার পেরোতে পারলেই হয়।

'বুজজি,' বলল দানব। 'বডার আর কদ্দূর?'

'দেড়-দু' মাইল হবে হয়তো।' বুক পকেট থেকে হাতঘড়ি বের করে সময়

দেখল রানা—ইটালিয়ান সময় প্রায় দুটো। অর্থাৎ এখানে তিনটা, ভাবল ও। এ দেশ এক ঘণ্টা আগে। আগের জায়গায় রেখে দিল ও ঘড়ি। জ্বলজ্বলে লিউমিনাস ডায়ালের জন্যে ওটা এখন পরে থাকা মারাত্মক বিপজ্জনক। অন্ধকারে অনেক দূর থেকে দেখা যাবে।

'আইয়া পরছে,' বলল বুরুজ আলি। সাথে সাথে সামনে থেকে এসে ওদের গ্রাস করল ছায়াটা। চিতার মত ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ পায়ে ছুটল ওরা। স্টেন বাগিয়ে বুরুজ আলি থাকল পিছনে। ছায়াটা একেবারে গাঢ় নয়, তবে ওদের সে জন্যে অসুবিধে হলো না। ছায়ার সাথে ক্যামোফ্লেজড় ইউনিফর্ম মিলেমিশে একাকার, তার ওপর শত্রু রয়েছে উঁচুতে, মাটি আর বোল্ডারের পটভূমিতে কিছু টেরই পেল না ওরা প্রথমে।

টের পেল যখন ওরা প্রায় বারো আনি পথ পেরিয়ে গেছে। বাতাসের চাপে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলে কাত হয়ে চাঁদটাকে পেরিয়ে গেল হারামী মেঘ। অথচ লেজ যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল ওটার, আরও অন্তত দু'মিনিট চাঁদ আড়াল করে রাখার কথা ছিল। থামল না রানা-বুরুজ আলি, বরং গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল দৌড়ের।

একেবারে বনের প্রান্তে পৌঁছে গেছে, এই সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল এক রক্ষীর। দুর্বোধ্য এক চিৎকার দিয়ে উঠেই গুলি ছুঁড়ল সে, পরক্ষণে কয়েকটা অটো রাইফেল হুঙ্কার ছাড়ল একযোগে। গুলির সাথে অনেকগুলো কণ্ঠের হাঁক-ডাকের আওয়াজে ওদের ডানে-বাঁয়ে আরও কয়েকজন সাড়া দিল। শেষের এরা কাছেপিঠেই আছে সন্দেহ হলো ওদের। তার সাথে যোগ হলো আরও কিছু দূরাগত কণ্ঠ ও কুকুরের কলজে হিম করা হুঙ্কার।

সাঁৎ করে বনের ছায়ায় ঢুকেই মোটা কাণ্ডের এক গাছের গোড়ায় বসে পড়ল ওরা। রানার হাতে ওয়ালথার বেরিয়ে এসেছে আগেই। দ্রুত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল দুজনে। না, ধারেকাছে নেই কেউ, অন্তত এখনই ধরা পড়ার ভয় নেই।

তবে আসছে ওরা, চারদিক থেকে। ঘিরে ফেলবে অল্পক্ষণের মধ্যে। এদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন হবে। খুবই কঠিন হবে। বলকান অঞ্চলের কোন জাতিই সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী একে অন্যের সাথে গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত এরা—মায়ের কোল থেকে নেমেই হাতে অস্ত্র তুলে নেয়া এদের প্রকৃতি। জন্মশিকারী। দয়ামায়াহীন, নির্দয় এবং ধূর্ত।

এদের হাত থেকে বাঁচতে চাইলে এখন কেবল নিঃশব্দচারী হলেই চলবে না, প্রেতের মত অশরীরীও হতে হবে। নইলে অল্পদিনের মধ্যে বিসিআইয়ের দেয়ালে চওড়া কালো বর্ডারের ফ্রেমে বাঁধানো মাসুদ রানার ছবি উঠবে—বিদেহী এম আর নাইনের স্মরণে স্মৃতিচারণও হয়তো করা হবে। বুরুজ আলির ছবি টাঙানো হবে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় ও তার কাউনিয়ার বাড়িতে।

সন্তর্পণে গভীর বনের দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। ক্রোয়াটদের ওদেরকে ঘিরে ফেলার সুযোগ দেয়া যাবে না কিছুতেই। শুকনো ডালপালা ভাঙার মুট্ মুট্ আওয়াজ আসছে বাঁ দিক থেকে। শব্দ কানে যেতেই ডানে যেতে শুরু করল রানা-বুরুজ আলি, কোনাকুনি। বসনীয় বর্ডারের দিক যাতে গুলিয়ে না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রানার। যদিও সঠিক পথেই চলেছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ কিছুটা রয়েই

গেছে, হাজার হলেও মুখস্থ বিদ্যা। তা-ও খাটাতে হচ্ছে রাতের বেলা। চাঁদ আর দুয়েকটা নক্ষত্র এ মুহূর্তে একমাত্র ভরসা। মিনিট দশেক নিরাপদেই এগোল দু'জনে।

হাঁটার গতি আপনাআপনি বেড়ে যেতে বোঝা গেল ঢাল বেয়ে নামছে ওরা। একটু একটু করে বেড়েই চলেছে গতি। চারদিক নিকষ কালো, গাছের ফাঁক ফোকর গলে এক-আধটু আলোর আভাস যা আসছে, কোন কাজেই লাগছে না তা। একটু দেখে চলা গেলে ভাল হত, ভাবল রানা। খানাখন্দে পড়ে কখন হাত-পা ভাঙে, সেই ভয়ে তটস্থ ও।

বুরুজ আলির কথা ভেবে ভারি অবাক লাগছে। মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় ভর করে হাঁটছে মানুষটা—বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই। একেক সময় রানার মনে হচ্ছে সে বোধহয় নেই ওর পাশে, পিছিয়ে পড়েছে অথবা অন্ধকারে পথ ভুল করে আরেকদিকে চলে গেছে। অথচ যতবারই নিশ্চিত হতে ঘুরে তাকিয়েছে, ততবারই ঠিক দু'হাতের মধ্যে দেখতে পেয়েছে দানবীয় ছায়াটাকে। সমানতালে হাঁটছে। আশ্চর্য! এত নিঃশব্দে হাঁটে কি করে ও অতবড় বপু নিয়ে? রানার পায়ের নিচে ছোট একটা শুকনো ডাল পড়ে মুট্ শব্দে ভাঙল।

আচমকা জায়গায় জমে গেল ওরা, ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। খুব কাছেই খুক্ করে কেশে উঠল কেউ। বোঝা গেল আওয়াজ গিলে খাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল মানুষটা, কিন্তু সফল হয়নি। গার্ড! ভাবল রানা, কতজন? একটু দূরে আরেক ধরনের আওয়াজ শোনা গেল—ছর ছর ছর ছর! বোঝা গেল তলপেটের চাপ খালাস করছে কেউ। তার মানে দু'জন। নাকি আরও আছে?

পাশ কাটিয়ে সরে পড়বে কি না ভাবছিল রানা, তখনই ফিসফিসের চাইতে চুল পরিমাণ উঁচু কণ্ঠে কেউ ডেকে উঠল, 'সালোবিন!' এই লোকই কাশি দিয়েছিল বোধহয়। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

'দা?' প্রায় একই স্কেলে বলল আরেক কণ্ঠ। পানি পড়ার আওয়াজ কমে আসছে।

'এইমাত্র একটা আওয়াজ শুনলাম!'

'কিসের?'

'মনে হলো একটা ডাল ভাঙল।'

আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়ল রানার। সর্বনাশ! খুব কাছে রয়েছে লোকগুলো, যদি টর্চলাইট জেলে বসে, একেবারে হাতেনাতে ধরা খেতে হবে।

'তোমার মাথা! বনে ঢোকার পর থেকেই তো কতরকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তুমি।'

'আরে না! বিশ্বাস করো, এবার মিথ্যে শুনিনি। সত্যি কেউ…'

'দেখো কোন শেয়াল-টেয়াল হবে বোধহয়,' হাসল লোকটা।

'দূর!' খেপে উঠল প্রথমজন। 'সব সময় ঠাট্টা ভাল্লাগে না!'

'আচ্ছা, রাখো। আসছি।'

'নাপ্‌রেদ (তাড়াতাড়ি)!'

ছরছরানী প্রায় থেমে এসেছে। রানা বুঝল না চাইলেও প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অপ্রিয় কাজটা করতেই হবে এখন। নইলে যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবে ওরা।

এ পর্যন্ত বেশ নিরাপদেই আসা গেছে, এখন যদি এদের কারণে অবস্থান ফাঁস হয়ে পড়ে, সমূহ বিপদ। যারা জানে না ওরা কোথায় আছে, জেনে যাবে সামান্যতম আওয়াজ হলেই। কাজেই ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রশ্নই আসে না এখন।

বাঁ হাত বুরুজ আলির কাঁধে রাখল ও, ডান হাতে কমাণ্ডো ছুরি প্রস্তুত। 'নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে,' দম বন্ধ রেখে ফিসফিস করে বলল লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে। 'কুইক!'

'আমি রেডি।'

'টর্চটা কোথায়?' কাজ সেরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল দ্বিতীয়জন। 'জ্বেলে দেখে নিলেই তো পারো!' বলতে বলতে এগিয়ে এল। একটা গাছ ঘুরে দ্রুত এগোল রানা। পরেরজনই ওর লক্ষ্য। তার পিছনে পৌছতে চায়।

'কিন্তু···আলো জ্বালতে যে নিষেধ করল?'

'আরে কিছু হবে না! নিচেরদিক মুখ করে জ্বালো।'

তাই করল প্রথমজন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের তো বটেই তার চোদ্দ গুষ্টির পিলেও প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠল দু'হাতের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকা বুরুজ আলিকে দেখে। আলো ধরে থাকা হাতটা ভীষণ এক ঝাঁকি খেল তার। 'ওরে, মা!'

'কি···!' সালোবিনের বাকি কথা থামিয়ে দিল রানা পিছন থেকে মুখ চেপে ধরে। পরক্ষণে সুঁইয়ের মত কিছু একটা বিধল তার পিঠের বাঁ দিকে, মৃদু এক ঝাঁকি খেয়ে ওর হাতের মধ্যে স্থির হয়ে গেল সে। ভাঁজ হয়ে গেল দু'পা।

ওদিকে নিষ্পাপ হাসি ফুটল বুরুজ আলির প্রকাণ্ড মুখে। 'ডরাইছো, ন্যাবাই (মিয়া ভাই)? পানি পরা খাবা?'

মুহূর্তের জন্যে জড়োপদার্থের মত জমে থাকল লোকটা, কাঁপছে থর থর করে। হাত থেকে টর্চ পড়ে গেল, তবু জ্বলছে ওটা। কখন অটোসুইচ টিপে দিয়েছিল কে জানে! 'সালোবিন!' ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠেই কাঁধের রাইফেলের দিকে হাত বাড়াল সে।

ছোট একটা লাফ দিল বুরুজ আলি, পিঠ বাঁকা 'দ' হয়ে শূন্যে উঠে গেল ফুট তিনেক। ওই অবস্থায় বাঁ পা জায়গায় রেখে ডান পা দ্রুত পিছিয়ে নিয়েই সজোরে সামনের দিকে ছুঁড়ল সে ওপরমুখো করে। পুরু সোলের ভারী বুটের ডগা 'খটাশ!' শব্দে আছড়ে পড়ল লোকটার থুতনির হাড়ে। ধনুকের মত পিছনদিকে বাঁকা হয়ে গেল গার্ড, চোখ উল্টে গেছে, পড়ে যাচ্ছে, এই সময় ঝুপ করে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াল সে। ছুরি ধরা ডান হাত ভাঁজ করে নিয়ে এল বাঁ কাঁধের ওপর, তারপর অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে লোকটার গলা সই করে আড়াআড়ি চালাল ওটা।

'ফশ্!' আওয়াজ উঠল দীর্ঘশ্বাসের মত। খাড়া অবস্থায় পুরো জবাই হয়ে গেছে গার্ড। আওয়াজটা ছিল তার বুকে জমে থাকা বাতাসের—ফাঁক পেয়ে ওই পথে বেরিয়ে গেছে। বাঁ হাতের মস্ত থাবায় খপ্ করে চুলের মুঠি ধরে তার পতন ঠেকাল বুরুজ আলি। আস্তে করে শুইয়ে দিল দেহটা। ততক্ষণে টর্চলাইট নিভিয়ে দিয়েছে রানা।

মৃতের ইউনিফর্মে ভাল করে ঘষে ছুরির রক্ত মুছল বুরুজ আলি, খাপে পুরে

রাখল ওটা। মিনিটখানেক অপেক্ষা করল ওরা দলে আর কেউ আছে কিনা বোঝার জন্যে, তারপর হাঁটা ধরল নিশ্চিন্তমনে। নেই কেউ। বিনা বাধায় আরও মিনিট দশেক নামল ওরা ঢাল বেয়ে। হাঁটায় শক্তি ক্ষয় করতে হচ্ছে না তেমন একটা, মধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় ঠেলে নিয়ে চলেছে। এর শেষ কোথায় ভাবছে মাসুদ রানা। কি আছে ঢালের শেষে?

একটু একটু করে পাতলা হয়ে আসছে গাছ, সামান্য হলেও কিছু আলো পাচ্ছে এখন ওরা। সে জন্যে বরং চিন্তিত রানা, ওরা যেমন খানিক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, ধারেকাছে কেউ থাকলে সে বা তারাও পাবে। তাই ভেবেচিন্তে বাঁদরের মত এক গাছের আড়াল থেকে আরেক গাছের আড়াল পর্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে শুরু করল ওরা। চাঁদ খানিকটা হেলে পড়েছে। কিন্তু আলোর তেজ একইরকম জোরাল আছে।

এত সহজে হাল ছেড়ে দিল ওরা? ভাবল রানা। লোকজন আর সবাই গেল কোথায়? টের পেল হাঁটার গতি কমে আসছে, তার মানে ঢাল শেষ। তারপর কি, চড়াই? আরও মিনিট পাঁচেক এগোতে আচমকা শেষ হয়ে গেল বন। সামনে কয়েকশো গজ ফাঁকা, ছোটখাট ঝোপঝাড় আর বোল্ডার ছাড়া কিছু নেই, তারপর আবার বন। কেমন একটা আওয়াজ আসছে সামনে থেকে।

'দাঁড়াও,' বুরুজ আলিকে বলল ও চাপা কণ্ঠে। 'কিসের শব্দ?'

বিশাল এক ওক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পাতল দু'জনে। হঠাৎ করে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইল রানার দেহ। গত দেড়-দুই ঘণ্টা মারাত্মক ধকল গেছে দেহমনের ওপর দিয়ে। প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার, প্রাণ হারানোর আশঙ্কায় ছিলার মত টান্ টান্ হয়ে ছিল দেহের প্রতিটি পেশী, সুযোগ পেয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে শুরু করে দিল সেগুলো। তার সাথে চেগিয়ে উঠল দেহের এখানে-ওখানে পাওয়া অসংখ্য জখমের ব্যথা।

আশ্চর্য, এতক্ষণ টের পায়নি ও কিছুই। এঞ্জিনে আগুন ধরে যাওয়ার ফলে যে ওর দুই হাঁটুর চামড়াও ঝলসে গেছে, জ্বলুনি শুরু হওয়ায় এইমাত্র টের পেল। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত, চিবুক-ঘাড়-কপাল, পাল্লা দিয়ে জ্বালা করছে।

একই অবস্থা বুরুজ আলিরও। এখানে-ওখানে টনটনে ব্যথা আর জ্বলুনি শুরু হওয়ায় সে-ও বিস্মিত হলো। তবে ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা দিল না। 'পানির শব্দ,' বলল সে। 'খাল-টাল না তো?'

চোখ কোঁচকাল রানা। 'খাল? এ তল্লাটে কোন খাল নেই। ওটা হয় কোন পাহাড়ী ঝরনা, নয়তো নেরেতভা নদী। না, নদী হতে পারে না, ঝরনাই হবে। নেরেতভা এখানে আসবে কোথেকে?' প্রশ্নটা নিজেকেই করল।

দু'মিনিট পর আড়াল ছেড়ে বের হলো ওরা, রুদ্ধশ্বাসে ছুটে পেরিয়ে গেল জায়গাটা, ঢুকে গেল বনে। কেউ চেঁচিয়ে উঠল না, গুলিও হলো না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার পা বাড়াল দু'জনে। কিছুটা এগোতে শুরু হলো চড়াই। দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল, দুটো কুকুর ডাকছে। পাঁচ মিনিট পর পানির উৎস চোখে পড়ল ওদের। ঝরনা। বড় কয়েকটা বোল্ডারের আড়ালে বসে ঠাণ্ডা পানিতে যথাসম্ভব নিঃশব্দে হাত-মুখের রক্ত ধুয়ে নিল দু'জনে। পানি খেল আঁজলা ভরে।

তারপর আবার হাঁটা। রানার অনুমান চড়াইটা অতিক্রম করলেই বসনীয় বর্ডারের কাছে পৌঁছে যাবে ওরা, যদি পথ ভুল না হয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে এগোনো বেশ দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, বেশ খাড়া পথ। চার হাত পায়ের সাহায্যে এক ফুট, দুই ফুট করে উঠতে হচ্ছে। আবার দুটো কুকুরের ডাক ভেসে এল, এবার বেশ কাছে। থেমে ঘুরে তাকাল রানা। সেই দুটো না তো? এত কাছে পৌঁছে গেল কি করে এরমধ্যে? ওদের গায়ের গন্ধ আবিষ্কার করে বসেনি তো কোনভাবে?

তা হয় কি করে? ভাবল ও। অবশ্য হলে অসুবিধে নেই। যদি অনুসরণ করে আসেও ওরা, ঝরনার কাছে এসে দিক্ হারিয়ে ফেলবে। কারণ পানিতে খুঁজলেও ওদের গন্ধ পাবে না জন্তু দুটো।

আবার নিশ্চিন্তে এগোল। একটানা আধঘণ্টা চলার পর শেষ হলো চড়াই। ওপর থেকে আধমাইল দূরে দুই সারি দীর্ঘ আলো দেখতে পেল মাসুদ রানা। ওটাই বর্ডার। পঞ্চাশ গজ ব্যবধানে দুই সারি নগ্ন বালব্ জ্বলছে খুঁটিতে ঝোলানো তারের সাথে। অবশ্য সব বালব্ নয়, কোথাও কোথাও দুটো-তিনটে এমনকি পাঁচটা পর্যন্ত নেই। ফিউজড্। মাঝের ফাঁকা জায়গাটা নো ম্যানস ল্যান্ড।

এপাশে, পাহাড়ের পায়ের কাছে পরিচিত একটা স্থাপত্যশিল্পের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল ও। পাহাড়ী জমিতে পানি দেয়ার জন্যে রোমান্‌দের তৈরি প্রাচীন নালা। অসংখ্য পাথরের খুঁটির ওপর দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে পাথরেরই তৈরি নালা, বেশ চওড়া। এখন অবশ্য নালা নেই, আছে খুঁটিগুলো। জংলা গাছ জন্মেছে ওগুলোর সারা গায়ে-মাথায়। অতীতে কোন এক কালে রোমানরা শাসন করত প্রায় পুরো বলকান এলাকা, এই নালা সে সাক্ষ্য বহন করছে।

নো ম্যানস ল্যান্ডের যেখানটায় অন্ধকার বেশি চওড়া, হাত তুলে সেদিকটা দেখাল রানা বুরুজ আলিকে, মাথা ঝাঁকিয়ে এগোতে ইঙ্গিত করল। ঠিক সেই মুহূর্তে নাকে বিপদের গন্ধ পেল ও। সর সর করে দাঁড়িয়ে গেল ঘাড়ের খাটো চুলগুলো। রানার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা সতর্ক হওয়ার নির্দেশ জানাল ওকে। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে ছিল, সেখানেই ঝপ্ করে বসে পড়ল। টান মেরে বুরুজ আলিকেও বসাল।

বুরুজ নিজেও সম্ভবত টের পেয়েছিল কিছু, তাই বসেই পিছনে ঘুরে তাকাল। ওদের পঁচিশ-ত্রিশ গজ পিছনে রয়েছে সাক্ষাৎ যমদূত—দু'জন। এক পা দু'পা করে এগিয়ে আসছে এদিকেই, তবে ভঙ্গিটা অনিশ্চিত। বোঝা যায় ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। অবস্থান অনুমান করতে পেরেছে খুব সম্ভব, তবে নিশ্চিত হতে পারেনি। তাই একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত। এবং ভীত। দু'পা এগোয় তো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে, রাতকানা মুরগির মত গলা সামনে বাড়িয়ে একবার ডানে তাকায়, একবার বাঁয়ে।

দেখলেই বোঝা যায় প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে লোক দুটো। এগোতে মন চায় না, প্রচুর সময় নষ্ট করছে। চাঁদের আলোয় ওদের হাতে চকচকে দুটো চেক এম-সিক্সওয়ান সাব মেশিনগান দেখা যাচ্ছে।

সন্তর্পণে নিজেদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল রানা ও বুরুজ আলি। হামা দিয়ে খানিকটা করে সরে দু'জনে দুই ওকের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

প্রস্তুত। বন এখানটায় বেশ ঘন, এক ফোঁটা চাঁদের আলোও মাটিতে পৌঁছতে পারছে না। বিশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে দুই গার্ড। এখনই ঢুকে পড়বে আঁধারের রাজ্যে। মাসুদ রানার সোজাসুজি যে রয়েছে, সে বেশ খাটো। অস্ত্র বাগিয়ে সামনে ঝুঁকে আছে সে, দৃষ্টি দিয়ে অন্ধকার ভেদ করতে চাইছে লোকটা মরিয়া হয়ে।

অন্যজন সঙ্গীর চেয়ে কম করেও আধ ফুট লম্বা। বুরুজ আলির কয়েক ফুট দূরে রয়েছে সে। রানা ও বুরুজ আলি দীর্ঘক্ষণ থেকে অন্ধকারে রয়েছে বলে ওদের তুলনায় বহুগুণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সব।

সাক্ষাৎ মৃত্যুর দু'ফুটের মধ্যে পৌঁছেও কিছুই টের পেল না প্রথমজন। যখন পেল, রানার ছুরি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে তার হৃৎপিণ্ড। ডান হাতের সাথে বাঁ হাতও চালিয়ে দিয়েছে মাসুদ রানা, যাতে চেঁচাতে না পারে, সেজন্যে কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে লোকটার।

বুরুজ আলি ছোরা-ছুরির ধার দিয়েও গেল না এবার। দ্বিতীয় গার্ড ওর গাছের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে আড়াল ছেড়ে এগিয়ে এল। পিছন থেকে ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে। এমনভাবে ধরল যাতে লোকটার নাকমুখ পুরোটাই চাপা পড়ে তার বাহু আর হাতের ভেতরদিকের মাংসল অংশে, টুঁ শব্দটিও করার সুযোগ না পায় সে। একই মুহূর্তে হাতটা ওপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে তার মাথার পিছনের চুল মুঠো করে ধরল, এবং বাঁ হাতে শক্ত করে ধরল তার বাঁ কাঁধ—যাতে ঘুরে না যায় দেহটা সময়মত।

গার্ড ব্যাপার ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই তার মুঠো করা চুল ধরে সামনের দিকে হ্যাঁচকা এক টান মারল বুরুজ আলি, গা ঘুলানো 'মট!' আওয়াজের সাথে ঘাড় ভেঙে গেল লোকটার। রানা আর সে প্রায় একই সাথে মাটিতে শুইয়ে দিল মৃতদেহ দুটো।

এমন সময় কুকুর ডেকে উঠল আবার। বেশ কাছে। হয়তো ঝরনার ওপারে পৌঁছে গেছে। ব্যাপারটা তখনই খেয়াল হলো রানার। সালোবিনকে ছুরি মারার সময় এক হাতে তার মুখ চেপে ধরেছিল ও, নিজের গায়ের সাথে চেপে ধরে রেখেছিল তাকে কিছু সময়ের জন্যে, সেটাই হয়তো কাল হয়েছে। তার দেহে রানার গন্ধ পেয়েছে অস্বাভাবিক ঘ্রাণশক্তির কুকুর। সেই গন্ধ অনুসরণ করেই আসছে ওরা।

ওয়াকি-টকিতে সালোবিনদের সাড়া না পেয়ে ব্যাপার কি বোঝার জন্যে এসেছিল বোধহয় অন্য গার্ড ইউনিট। হ্যাঁ, ঠিক তাই। তার মানে ঝরনার এপারেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে অনুসরণকারীরা। ওপারে যখন গন্ধের সূত্র হারিয়ে ফেলবে কুকুর, তখন অবশ্যই এপারে আসবে ওরা, আবার গন্ধ পাবে। ভুল হয়ে গেছে, মনে মনে আফসোস করল রানা, ঝরনায় স্রোতের অনুকূলে বিশ-পঁচিশ গজ হেঁটে গিয়ে এপারে পা রাখা উচিত ছিল, তাহলে এই ঝামেলা হত না।

হঠাৎ খেয়াল করল মেঘ জমেছে আকাশের ঈষাণ কোণে। বেশ দ্রুত ছড়াচ্ছে। ঝড় শুরু হবে নাকি? মনে মনে খুশি হলো ও, এ সময় ব্যাপারটা ঘটলে অনেক সুবিধে হবে ওদের। একটু জোর বৃষ্টি হলে কুকুরও হারিয়ে ফেলবে সূত্র।

'যা অওয়ার অইয়া গেছে,' ওর সন্দেহের কথা শুনে জবাব দিল বুরুজ আলি।

'এহন চিন্তা কইররা অইবে কি? ওইত্তো বডার, এক লাফে ওকূলে (ওপারে) যাইয়া পরলে ঠেহায় কেডা আমাগো?'

বাতাসের গতি খেয়াল করল রানা। থম্ মেরে আছে। 'এখনই ওপারে যাওয়া ঠিক হবে কি না ভাবছি। এপারে চেঁচামেচি শুনলে ওপারের গার্ডরা সতর্ক হয়ে উঠতে পারে, ভেতরে ঢোকা সমস্যা হয়ে যাবে তাহলে আমাদের জন্যে।' থেমে কিছু ভাবল। 'ঠিক আছে, চলো, নামতে থাকি। পরেরটা পরে দেখা যাবে। আগে এ দুটোর একটা ব্যবস্থা করি, এসো।'

কলার ধরে লাশ দুটো টেনে নিয়ে চলল ওরা, অস্ত্র দুটোও। ঢালের কাছে এক জায়গায় অগভীর একটা খাদ দেখতে পেয়ে ফেলে দিল লাশ তার মধ্যে। অস্ত্র দুটো ফেলতে গিয়েও ফেলল না রানা শেষ পর্যন্ত। থাকুক আপাতত, কাজে লাগতে পারে। স্টেন কাঁধে ঝুলিয়ে ওর একটা হাতে নিল বুরুজ আলি।

সতর্ক পায়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে বেশ খাড়া হয়ে গেল পথ, রীতিমত ছুটতে হচ্ছে। গতি নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এরমধ্যে আকাশ ছেয়ে গেছে মেঘে, অন্ধকারে পথ দেখা যাচ্ছে না। ওপরে গার্ড কত কাছে এসে পড়েছে বোঝার উপায় নেই। পায়ের আঘাতে যদি দু'চারটে পাথর স্থানচ্যুত হয়, শব্দেই ওদের অবস্থান টের পেয়ে যাবে ব্যাটারা। সর্তক হওয়ার চেষ্টা করল ওরা।

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। শঙ্কাটা দূর হতে না হতেই ছোট এক পাথরে পা দিয়ে ফেলল রানা, দড়াম করে আছড়ে পড়ল। সময়মত বুরুজ আলি ধরে না বসলে গড়িয়ে কতদূর যেত বলা যায় না। রানার পতনের গতি কমল ঠিকই, কিন্তু পাথরটাকে সামাল দেয়া গেল না। ছুটে গিয়ে ছোট পাথরের এক ঢিবির ওপর ড্রপ্ খেল ওটা, লেজে অসংখ্য অনুসারীকে নিয়ে সবেগে নিচের দিকে ছুটতে শুরু করল। দল বেঁধে যাওয়ার পথে জোর আওয়াজ তুলছে।

ঝপ্ করে বসে পড়ল ওরা, তবু থামে না গতি। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই আঁকড়ে ধরে নিজেদের ঠেকানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রানা আর বুরুজ আলি, কোথাও একটু আঙুল বাধানোর জন্যে উন্মত্তের মত পাথুরে মাটি খাবলে চলেছে। অবশেষে অর্ধেক ঢাল পেরিয়ে এসে থামল। নিজেদের ঠেকাতে ব্যস্ত ছিল বলে দখল করা অস্ত্র দুটো ছেড়ে দিতে হয়েছে আগেই, গড়িয়ে-ডিগবাজি খেয়ে নিচে নেমে গেছে। টন্-টন্ করছে ওদের দু'জনের প্রতিটা আঙুলের নখ, দু'একটা উল্টেই গেছে হয়তো।

ঘাপটি মেরে বসে হাঁপাতে লাগল রানা-বুরুজ আলি। নজর পিছনে। হঠাৎ ভেসে এল চিৎকারটা—মোটা গলার কমান্ড, একই সাথে কুকুরের হাঁক, কয়েকজোড়া পায়ের ধুপ্ ধাপ্ দৌড়ে আসার আওয়াজ। ওপরে তিন-চারটে জোরাল টর্চলাইট জ্বলে উঠল, ব্যস্ত-সমস্ত আলোর বীম ঘুরছে এদিক-ওদিক।

'কাম বুজি অইছে!' শুয়ে পড়ে নিজেকে আড়াল করার প্রাণান্ত চেষ্টার ফাঁকে ফিসফিস করে বলল বুরুজ আলি। 'গেরস্ত মুরহা-চোর ধইররা হালাইছে।'

এত দুঃখেও হাসি পেল রানার। কথা শুনলে মনে হয় বুঝি রসিকতা করছে লোকটা, আসলে তা নয়। বরিশাল অঞ্চলের কথাবার্তাই এরকম। অনভ্যস্তদের

কানে সহজ-স্বাভাবিক কথাও হাসির মনে হয়। জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু সুযোগ হলো না।

ওপর থেকে এক সাথে গর্জে উঠল ছয়-সাতটা এম-সিক্সটিওয়ান, বিকট শব্দে চমকে গেল ওরা। কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা। মেশিনগানের সম্মিলিত হুঙ্কারে কাঁপছে দিনারিক আলপস, ওদের চারপাশে বৃষ্টির মত পড়ছে বুলেট, গ্র্যানিট পাথরের টুকরো এবং উপড়ে আসা ঝোপঝাড়-চারাগাছ, ঘাসের কণা, মাটি।

দশ সেকেন্ড পর থামল গুলি-বৃষ্টি, দৌড়ে নেমে আসতে শুরু করল দুই গার্ড। দৌড়ের ফাঁকে একটু থামল তারা, এক পশলা গুলি বর্ষণ করে আবার নামতে শুরু করেছে। তাদের আগে আগে রয়েছে ভয়ালদর্শন এক জোড়া হাউন্ড।

এমন সময় এক ফোঁটা-দু'ফোঁটা করে পানি পড়তে আরম্ভ করল আশেপাশে। একটু বাড়ল গতি, থেমে গেল, তারপর হঠাৎ করেই শুরু হলো ঝম্-ঝম্ বৃষ্টি। এত ঘন হয়ে ঝরছে পানি যে বর্ডারের সব আলো মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওদের চোখের সামনে থেকে। আবছা আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না ওদিকটায়। এদিকে মাথার ওপরে টর্চলাইটের নাচানাচি। নেমে আসছে গার্ড কুকুরসহ।

আরেকটু আগে বৃষ্টি শুরু হলে হয়তো কুকুরের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যেত, এখন সে পথ আর নেই, একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে ওরা। আলো ফেললেই ধরা পড়ে যাবে রানা-বুরুজ আলি। তাই ঘটল, এবং আচমকা বাঘের মত হুঙ্কার ছেড়ে নতুন উদ্যমে লাফ দিল কুকুর। ওরা দু'জন চিৎ হয়ে পড়ে আছে লাশের মত, দেহের আড়ালে যার যার হাত প্রস্তুত। এ ছাড়া আর কোন পথও ছিল না।

এরকম পথে চলে অভ্যস্ত বলেই ঠিক সময়মত ব্রেক করতে সক্ষম হলো গার্ড দুটো। থেমে পড়ল ওদের দশ গজ দূরে। কুকুরের চেইন টেনে ধরে সামনে তাকিয়ে থাকল। বারবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত টর্চের আলো বোলাচ্ছে চিত হয়ে পড়ে থাকা নিথর রানা ও বুরুজ আলির। তাদের হাত থেকে ছোটার জন্যে বেদম লাফ ঝাঁপ করছে হাউন্ড। 'মরে গেছে মনে হয়,' বলে উঠল এক গার্ড।

'তাই হবে,' বলল অন্যজন। কুকুরের বিরামহীন চিৎকারে বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল পরক্ষণে। 'অ্যাই, শালা, কুত্তার বাচ্চা, চুপ কর!'

'চলো, কাছে গিয়ে দেখে আসি,' প্রথমজনের কণ্ঠ শোনা গেল।

পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। শক্ত হয়ে মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় পড়ে থাকল ওরা দু'জনে, একেবারে মাথার ওপর কুকুরের হুঙ্কারে হিম হয়ে আসছে রক্ত। ওদের পাঁচ হাতের মধ্যে আবার থেমে পড়ল গার্ড দুটো। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির শব্দে আর সব চাপা পড়ে আছে, নিচে কোথাও মনের আনন্দে ব্যাঙ ডাকছে। নাম না জানা আরও কী সব পোকাও যেন।

দুনিয়া আলো করে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। 'মারো!' আলোটা চোখে পড়ামাত্র চিৎকার করে উঠল রানা, পরক্ষণে বিদ্যুৎবেগে উপুড় হলো দু'জনে। রানার হাতে পিস্তল, বুরুজ আলির হাতে স্টেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে অস্ত্র তোলার চেষ্টা করল বটে গার্ড দু'জন, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। বজ্রপাতের বিকট শব্দের আড়ালে চাপা পড়ে গেল রানা-বুরুজ আলির গুলির শব্দ।

প্রথম গুলি খেল গার্ড, পরমুহূর্তে কুকুর দুটো। ওপরে অপেক্ষমাণ দলের অন্যরা টের পেল না কিছু।

এক মিনিট পর গড়িয়ে নেমে যেতে থাকা লাশগুলো টপ্‌কে নিচের দিকে ছুটল রানা ও বুরুজ আলি। এ মুহূর্তে আর কেউ পিছু নেবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

পাঁচ

শুকনো বাতাস থেকে থেকে ঝাপ্‌টা মারছে নাকে-মুখে। চাঁদ ডুবে গেছে। ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রাতের পাখিরা, এখন আর বিশেষ শোনা যায় না তাদের ডাক। তবে পাহাড়ী নেকড়ের ডাক কানে আসছে। এখানে-ওখানে ডাক ছাড়ছে ওরা থেকে থেকে।

জোর পায়ে এগিয়ে চলেছে ওরা দু'জন। বর্ডার বিনা বাধায় ক্রস করেছে, বসনিয়ান গার্ডদের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়েনি কোথাও। তারপর থেকে একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা হাঁটার ওপর রয়েছে। বাইশ মাইল পথ পেরিয়েছে ওরা এরমধ্যে। সমতল হলে আরও বেশি যাওয়া যেত। তারওপর গোপনীয়তার কারণে যেখানেই মানুষ থাকার সম্ভাবনা আছে মনে হয়েছে, তার ত্রিসীমানার মধ্যেও যায়নি রানা। এতকিছুর পরও বাইশ মাইল সাড়ে তিন ঘণ্টায় অতিক্রম করে প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে ওরা।

একের পর এক উপত্যকা পেরিয়ে চলেছে। চারদিক অন্ধকার। গাছের পাতায় গোঙাচ্ছে শুকনো বাতাস। এদিকে বৃষ্টি হয়নি, একদম খটখটে শুকনো মাটি।

একটা ব্রিজ পার হলো ওরা। সামনে প্রকাণ্ড এক তেপান্তরের মাঠ। শক্ত, পাথুরে মাটি। আবাদের একেবারেই অনুপযুক্ত। সামনে ক্রমশ উঠে গেছে মাঠ, প্রায় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। এই সেই মাঠ, ভাবল রানা। তাড়া না খেলে এখানেই ওদের নামার কথা ছিল। তাও ভাল যে এতকিছুর পরও রাত থাকতেই পৌঁছানো গেছে।

ঘড়ি দেখল রানা। আর বড়জোর আধ ঘণ্টা বাকি আলো ফুটতে। আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে আরেকটু জোরে পা চালাল। কিন্তু যত এগোচ্ছে, ততই কমে আসছে গতি। পাথরের মত ভারী হয়ে গেছে পা, উঠতে চায় না। জোর খাটাতে হচ্ছে রীতিমত। একই অবস্থা বুরুজ আলিরও। ঘামছে সে দরদর করে। ভোঁস ভোঁস করে দম ছাড়ছে। বিশালদেহী হওয়ায় কষ্ট তারই বেশি হচ্ছে।

অবশেষে মাঠের শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা বহু কষ্টে। ভোরের আলো তার আগেই ফুটেছে। হালকা কুয়াশা ভাসছে চারদিকে। পিছনে তাকিয়ে চোখ কপালে উঠল রানার, এত চড়াই পেরিয়েছে বিশ্বাস হতে চাইল না। কম করেও বারোশো ফুট উঠেছে ওরা, এতই উঁচু মাঠের এ প্রান্ত। খুব ধীরে ধীরে উঠেছে বলে তেমন বোঝা যায়নি।

বড় এক পাইন বনের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। বুরুজ আলি লেপ্‌টে আছে

পিছনে। গাছগুলোর ওপর নজর বোলাতে বোলাতে সামনে এগোল ও। মনে হলো কিছু একটা খুঁজছে। মিনিট পাঁচেক পর থমকে দাঁড়াল রানা, পেয়ে গেছে যা খুঁজছিল। বিশাল এক পাইনের মোটা কাণ্ডের এক জায়গায় এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ ছাল নেই। ছুরি দিয়ে তুলে ফেলা হয়েছে। ভেতরে পাইনের সাদা গা দেখা যাচ্ছে। অল্প অল্প কষ গড়াচ্ছে ওখান থেকে। সাক্ষাতের নির্ধারিত জায়গা।

'হয়েছে,' ক্লান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল ও। 'এসো। বসে একটু জিরিয়ে নেয়া যাক এখানে।'

ধপ্ করে বসে পড়ল ওরা, পাশাপাশি দুই গাছে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল। 'আইয়া পরছি?' চেহারা বিকৃত করে দু'পা টান্-টান্ করে মেলে দিল বুরুজ আলি। হাই তুলল।

'হ্যাঁ।' শুয়ে পড়ার উদ্যোগ নিল রানা। আর এক ইঞ্চিও চলার ক্ষমতা নেই। চোখ জ্বালা করছে। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। তেষ্টাও পেয়েছে তেমনি। কখন আসবে ওরা? ভাবল রানা। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত দুটোয় সোফিয়ার লোক পাঠানোর কথা ছিল এখানে। জায়গামত নিয়ে যাবে ওকে। বিকল্প পরিকল্পনাও ছিল। প্রথম শিডিউল টাইম মিস হলে চার ঘণ্টা পর পর আরও দু'বার তারা আসবে কথা ছিল।

ঘড়ির হিসেবে প্রথম বিকল্প সময়ও পেরিয়ে গেছে। কাজেই এখন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। শেষবার ওদের আসতে এখনও অনেক বাকি। সিগারেট ধরাল রানা।

সূর্য উঠল একটু পর। বাতাস খানিকটা গরম হয়ে উঠতেই খুব দ্রুত কেটে যেতে শুরু করল কুয়াশা। সামনে নজর বোলাল ও। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গন্তব্য—অ্যাপথস। অনেক নিচে। দূরত্ব বোঝা মুশকিল। মনে হয় বুঝি কাছেই, লাফ দিলেই পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। আসলে চার মাইল দূরে।

পাহাড়-পর্বত ঘেরা দুর্ভেদ্য এক জায়গা—মুসলিম বাহিনীর সমরাস্ত্রের ঘাঁটি। ভেতরে মাকড়সার জালের মত সরু সরু পাকা রাস্তা। ঘাঁটির মূল ভবন প্রকাণ্ড। এক সময় রোমানরা শাসন করত এ অঞ্চল, ওটা তাদের তৈরি। ওটাকে ঘিরে আরও কয়েকটা ছোট ছোট ভবন, পাথরের তৈরি সব। প্রায় গোল ঘাঁটির এক মাথায় আছে লম্বা এক ছাউনি। জীপ-ট্রুপ ক্যারিয়ার ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে ওখানে। তার সামনেই হেলিপ্যাড। ফাঁকা। কিছু নেই প্যাডে।

অন্য প্রান্তে আছে একটা ডিম আকৃতির ঘেরা জায়গা। অ্যাম্ফি-থিয়েটার বা কলোসিয়াম ওটা। অতীতে রোম সম্রাটরা গ্ল্যাডিয়েটরদের লড়াই উপভোগ করত এখানে। মানুষে-মানুষে অথবা মানুষে-পশুতে লড়াই। স্রেফ মজা দেখার জন্যে নিরস্ত্র ক্রীতদাসদের ওর মধ্যে ফেলে দেয়া হত সিংহ অথবা নেকড়ের সামনে।

পাহাড় কেটে তৈরি দুটো পথ আছে ঘাঁটিতে ঢোকার, একটা মেটকোভিচ-অ্যাপথস সড়কের মাথায়, অন্যটা ইজান-অ্যাপথস সড়কের মাথায়। এই দুই পথ ছাড়া ভেতরে ঢোকার কোন উপায় নেই। গেট দুটোই অত্যন্ত সুরক্ষিত—পুরু স্টীলের তৈরি।

এপাশের গেটের এক অংশ দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। ইজান-অ্যাপথস

গেট। ঘাঁটির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে এক জোড়া ট্যাঙ্ক—খুব সম্ভব রাশিয়ার তৈরি টি-৩৪। বেশ পুরানো মডেল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার। সাথে আছে একটা ট্রুপ ক্যারিয়ার। বিদ্রোহী কোরলার অনুগত সৈনিকরা টহল দিচ্ছে গেটের সামনে। এছাড়া তেমন আর কোন তৎপরতা দেখা গেল না ওখানে। ঘাঁটিও ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

কলোসিয়ামের পাশে মোটামুটি বড় এক আর্মি ব্যারাক। তার সামনেও তেমন লোকজন দেখা গেল না। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক। সরকারের অনুগত অফিসার-সৈনিকরা পালিয়ে গেছে ঘাঁটি ছেড়ে, আশেপাশেই কোথাও গোপন আস্তানা গেড়েছে।

ঘাঁটির বাইরে গ্রাম। বেশ বড়—ঘরবাড়ি আছে প্রচুর। তবে এখানেও সেই এক অবস্থা, মানুষজন কম।

আরেকবার ঘাঁটির ওপর নজর বোলাল রানা। আজব এক জায়গা। সমরবিদদের মতে অ্যাপথস হচ্ছে ঈগল'স রুস্ট বা ঈগলের বাসা, জানে ও। অবস্থান ফাইভ ডিগ্রী ইস্ট অভ নোহোয়্যার এবং ইন দ্য মিডল অভ নোহোয়্যার। দুরারোহ, দুর্ভেদ্য পাহাড়-ক্লিফ চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। গেট ছাড়া ঢোকার কোন পথই নেই।

কোথায় রাখা হয়েছে বন্দী জেনারেলকে? ভাবল রানা, কোন্ ভবনে? ব্রিগেডিয়ারকে? একসাথেই রাখা হয়েছে, না আলাদা করে?

'বুরুজ আলি!' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'জে?'

'হাতে কিছুক্ষণ সময় আছে। বিশ্রাম করে নাও।'

'আচ্ছা।' মনে মনে বলল, করতে তো চাই। কিন্তু প্যাডের মইদ্যে খালি ডাহাডাহি করে যে!

'বেশি খিদে লেগে থাকলে অবশ্য জমবে না বিশ্রাম,' বলল রানা। 'আমার লেগেছে খুব, তোমার কি অবস্থা?'

ঘুরে তাকাল বুরুজ আলি। 'এট্টু এট্টু লাগতে আছে।'

হাসল ও মনে মনে। ওরও খিদে লেগেছে, এ কথা রানা না বললে কিছুতেই স্বীকার করত না লোকটা। 'এক কাজ করা যাক তাহলে। বনের মধ্যে খুঁজে দেখি আপেল বাগান পাই কি না। পেলে কিছুটা ঠাণ্ডা করা যাবে পেট।'

অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা। 'বোনের মইদ্যে আপেল বাগান আইবে ক্যামনে!'

'এরকম জমিতেই আপেল জন্মে ভাল। কমলা, আঙুরও জন্মে। চলো, ঘুরে দেখে আসি।'

'আমনে বিশ্রাম করেন, আমি যাইয়া দেহি।' ওকে আর কিছু বলার সময় না দিয়ে চলে গেল লোকটা। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা দু'হাত দিয়ে বালিশ বানিয়ে। মাথার মধ্যে আকাশ-পাতাল চিন্তা। পাখিদের গান শুনতে শুনতে দু'চোখ লেগে এসেছিল প্রায়, এমন সময় ফিরল বুরুজ আলি। হাতে বড় দুই থোকা পাকা আঙুর আর কয়েকটা কমলা। মুখে গাল ভরা

হাসি।

'এই পাইছি,' বলল সে। 'আপেল বাগান দেহি নাই কোতাও।'

'আর দরকার কি?' উঠে বসল রানা। 'কতদূরে এগুলোর বাগান?'

যেদিকে গিয়েছিল, হাত তুলে সেদিকটা দেখাল বুরুজ আলি। 'উদিকে। একটা ঝরনার ধারে। অনেক বর বাগান।'

নীরবে ওগুলো সাবাড় করল দু'জনে। পেট একটু ঠাণ্ডা হতেই বুজে এল চোখ। ঘুমিয়ে পড়েছিল। আচমকা ভেঙে গেল রানার ঘুম। চোখ মেলতেই ঠিক নাকের সামনে একটা এ কে অ্যাসল্ট রাইফেলের চকচকে নল দেখতে পেল। নল বেয়ে নজর ওপরে উঠল ওর। যা দেখল, ঠিক দেখল কি না ভেবে সন্দেহ হলো।

এক মেয়ে ধরে আছে ওটা। অপূর্ব সুন্দরী এক মেয়ে। আঠারো-বিশের ওপরে হবে না বয়স। পরনে জিন্স, গায়ে ফেডেড জিনসের শার্ট, পায়ে কেড্স। টানা টানা দু'চোখে কাঠিন্যের কোন চিহ্নই নেই। পাঁচ ফুট সাতের কম হবে না সে, দেহের তুলনায় পা বেশি লম্বা। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা কুচকুচে কালো, ঘন চুল। পনি টেইল করা। বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম লেখানো উচিত ছিল এর, ভাবল রানা। চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও রানার্স আপ হতে পারত নিঃসন্দেহে।

উঠে বসতে গিয়ে বাধা পেল, রাইফেল দুলিয়ে শুয়ে থাকতে বলল মেয়েটি। তার পাশের লোকটিকে দেখল রানা আগ্রহ নিয়ে। ছয় ফুট চারের কম হবে না মানুষটা। তেমনি পাশে। ন্যাড়া মাথা। ডান হাতে একটা স্টেন ধরে আছে সে ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে। ত্রিশ-বত্রিশের মত বয়স। চাউনিতে কৌতুক।

বুরুজ আলিকে দেখল মাসুদ রানা। তারও ঘুম ভেঙেছে। স্থির হয়ে পড়ে আছে সে, বুকে আর কপালের পাশে দুটো রাইফেলের নল ঠেকে আছে তার। রাইফেলধারীদের দেখল রানা। দু'জনেই যুবক, বিশ থেকে বাইশের মধ্যে বয়স।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'তোমরা সেম সাইড করে ফেলছ।'

'কারা তোমরা?' রাগ প্রকাশ পেল সুন্দরীর কণ্ঠে। সার্বো-ক্রোয়াটের পরিবর্তে ঝরঝরে ইংরেজিতে কথা বলছে সে। 'এখানে কি করছ?'

'কি মুশকিল! ঘুম থেকে জাগিয়ে এ প্রশ্নের কোন অর্থ হয়?'

এক পা এগোল টেকো। 'বেশি স্মার্টনেস দেখাতে যেয়ো না, মিস্টার। যা প্রশ্ন করা হয় তার সোজাসুজি জবাব দাও,' এ-ও চোস্ত ইংরেজিতে বলল।

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'প্রশ্নটা কি?'

'কে তুমি?' বলল মেয়েটা।

'মাসুদ রানা।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল টেকো। 'মাসুদ রানা মারা গেছে। ক্রোয়াটরা খুন করেছে তাকে গতরাতে। আমরা খবর পেয়েছি।'

'তুমি স্পাই,' বলল মেয়েটি।

তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ও। 'তা ঠিক।' টেকোর দিকে ফিরল। 'চেষ্টা করেছে ওরা, কিন্তু পারেনি দেখতেই পাচ্ছ।'

দ্রুত চোখাচোখি হলো ওদের দু'জনের মধ্যে। 'এখানে কেন এসেছ?'

বুড়ো আঙুল বাঁকা করে গাছের ছাল তোলা অংশটা দেখাল ও। 'এত সুন্দর আর্ট কে করল জানতে।'

'হুঁম! ওয়েল ইনফর্মড,' মাথা দোলাল টেকো। 'কিন্তু চালে একটু ভুল করে ফেলেছ, বন্ধু।'

'কি রকম?' চোখ কোঁচকাল রানা।

'মাসুদ রানার একা আসার কথা ছিল। কিন্তু তুমি...'

'এই কথা?' বুরুজ আলিকে দেখল ও হাসি মুখে।

'হ্যাঁ,' বলল মেয়েটি। 'এই মাঠে পা রাখার পর থেকেই তোমাদের ওপর কড়া নজর রেখেছি আমরা।'

'এবং?'

লম্বা করে দম নিল টেকো। 'এবং লক্ষ রাখছিলাম দূর থেকে। যদি চাইতাম, এতক্ষণে পাখির খাবারে পরিণত হতে তোমরা।'

'ভাগ্য ভাল আমাদের যে তা চাওনি।' একটু বিরতি দিল রানা। 'তোমরা অহেতুক সময় নষ্ট করছ। আমাদের সোফিয়ার কাছে নিয়ে চলো, প্লীজ!'

মেয়েটির চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল। 'সোফিয়া! সে কে?'

'আমার বন্ধু, ব্রিগেডিয়ার কিয়েরযেকের স্ত্রী,' হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠল রানার। 'তার সাথে দেখা করতে এসেছি আমি।'

'কিন্তু...'

'তুমি নিশ্চই যেলেনিকা? সোফিয়ার ছোট বোন?'

থমকে গেল সে। দ্রুত নজর বিনিময় করল সঙ্গীর সাথে। কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। 'আর আপনি পাদ্রা?' টেকোর উদ্দেশে বলল রানা। 'ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেস?'

সে-ও থমকাল, তবে প্রভাবিত হলো না। ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল। "উই লাভ অ্যাজ ওয়ান, উই হেট অ্যাজ ওয়ান। উই হ্যাভ ওয়ান ফো অ্যান্ড ওয়ান অ্যালোন"। কবিতাটার শেষ লাইন কি?'

'একটামাত্র শব্দ,' বলল ও। 'সার্বিয়া।'

প্রায় সাথে সাথে অস্ত্র সরিয়ে নিল মেয়েটি। লজ্জা পাওয়া হাসি ফুটল মুখে। হেস স্টেন কাঁধে ঝুলিয়ে নিচু হয়ে এক হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমরা খুব দুঃখিত, মিস্টার রানা। আপনার...ইয়ে, আপনাদের ওপর ক্রোয়াট এয়ার রেইডের খবর শুনে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম আপনারা বেঁচে নেই। আগের দুই শিডিউল টাইমে এসে যখন পেলাম না আপনাদের, তখন,' থেমে শ্রাগ করল সে। 'বুঝতেই পারছেন।'

'শিওর, ক্যাপ্টেন। আপনাদের দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই,' উঠে হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল ও।

'ভেবেছিলাম তৃতীয় দফা আর আসব না। কিন্তু সোফিয়া ম্যাডাম জোর করে পাঠিয়ে দিলেন,' থেমে হেসে উঠল টেকো। 'তাঁর মতে ওদের রেইডে নাকি আপনার মৃত্যু হতেই পারে না। ভোরের দিকে এখানে আপনাদের দু'জনকে দেখা গেছে খবর পেয়ে এতক্ষণ নজর রাখছিল আমাদের লোক। বুঝতেই পারছেন আমরা

দু'জনকে আশা করিনি।'

'নিশ্চই। একাই আসার কথা ছিল আমার, কিন্তু আমার সঙ্গী কিছুতেই মানবে না। জোর করে এসেই ছাড়ল।'

'বিরো!' হাঁক ছাড়ল টেকো ক্যাপ্টেন। 'ওঁকে ছেড়ে দাও।'

বুরুজ আলিকে ছেড়ে এগিয়ে এল দুই যুবক। পরিচিত হলো ওরা। বিরো লেফটেন্যান্ট, রেগুলার। ক্যাপ্টেন হেসও তাই। অন্য যুবক মুক্তিযোদ্ধা, কারাক। সবার শেষে যেলেনিকা হাত মেলাল রানার সাথে। মিষ্টি এক টুকরো হাসি দিয়ে বলল, 'আপনাদের ঝামেলায় ফেলার জন্যে খুব লজ্জিত। আমাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।'

'ও কিছু নয়,' মেয়েটির নরম, উষ্ণ স্পর্শ ভাল লাগল ওর। 'তাছাড়া সতর্কই তো ছিলে তোমরা।'

হেসে উঠল সবাই একযোগে। 'যাওয়া যাক,' বলল ক্যাপ্টেন।

'রানা! রানা!' ঘরে ঢুকতেই ওর বুকের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সোফিয়া। দু'গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। 'তুমি সত্যি এলে? আমি এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না!'

এক হাতে তাকে ধরে থাকল ও, বাধা দিল না। কাঁদুক। কেঁদে কেঁদে নিজেই শান্ত হবে এক সময়।

'আমি ভেবেছি···ভেবেছি তুমিও বোধহয়···' কান্নার তোড়ে ভাষা হারিয়ে ফেলল আবার সোফিয়া। ঘরের আর সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কথা নেই কারও মুখে। যেলেনিকা পিছন থেকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে বোনের মাথায়। তার চোখেও পানি।

অনেক সময় লাগল সোফিয়ার নিজেকে ফিরে পেতে। মুখ তুলে ভেজা চোখে রানাকে দেখল সে, ধীরে ধীরে হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'তুমি এসেছ বলে আমি ভারি কৃতজ্ঞ, রানা। কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব, বুঝতে পারছি না।'

'বন্ধুর বিপদে বন্ধু আসবে, এটাই নিয়ম, সোফিয়া। এ জন্যে ধন্যবাদ জানানোর প্রয়োজন হয় না।' ভাল করে তাকে দেখল রানা। সোফিয়া আর যেলেনিকার চেহারায়-গঠনে বিশেষ তফাৎ নেই। বড়জনের দেহ একটু ভারি, এই যা। চোখের নিচে হালকা কালির ছাপও পড়েছে সোফিয়ার। 'ভাল কথা, তুমি কিন্তু আগের থেকে আরও সুন্দরী হয়েছ।'

'তাই নাকি?' চোখের পানি মুছে হাসল সে, রানাকে দেখল। 'তোমার মুখেই শুনলাম। তোমার বন্ধু কিন্তু বলে না কখনও।'

'কিছু মানুষ আছে ধ্যানকানা, কিছু হয় রঙকানা। সুলেমানোভিচও নিশ্চই ওই দলে পড়ে তাহলে, রূপকানা।'

সবাই হাসলেও রানার মুখে হাসি ফুটল না, বরং আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। 'কেমন আছে ও?'

'জানি না,' চোখ নামিয়ে নিল সোফিয়া।

'তোমার বাবা?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল সে। 'তাও জানি না।'

'ঘাঁটিতেই রাখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে। দুশ্চিন্তা কোরো না।'

মুখ তুলে গভীর দৃষ্টিতে রানাকে দেখল সোফিয়া। 'আগে করেছি। তুমি আসছ জানার পর থেকে আর করিনি। কিন্তু কাল রাতে তোমাদের ওপর ক্রোয়াটরা এয়ার রেইড চালিয়েছে শোনার পর থেকে...'

যেলেনিকা ও কারাক বাইরে কোথাও গিয়েছিল, ওদের ফিরে আসতে দেখে থেমে গেল সে। 'রেডি?'

'হ্যাঁ,' বোনের প্রশ্নের জবাবে বলল যেলেনিকা।

'চলো, রানা। আগে খেয়ে নাও। তারপর কথা হবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল সবাই। ঘরটা পাথরের, ছাদ টালির। অ্যাপথসের এক প্রান্তে জায়গাটা। খ্রিস্টান পল্লী ছিল এক সময়, এখন ফাঁকা। যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় সরে পড়েছে অধিবাসীরা। এখানে সাময়িক আস্তানা গেড়েছে ঘাঁটি থেকে পালিয়ে আসা সরকার অনুগত বাহিনীর বেশিরভাগ সদস্য। এরাই আশ্রয় দিচ্ছে সোফিয়াকে।

মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের অস্ত্র সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই মূলত যুদ্ধ করছিল বসনিয়ান বাহিনী। অ্যাড্রিয়াটিকে তাদের এক গোপন নৌ ঘাঁটিতে পৌঁছত মাল, সেখান থেকে এসে মজুত হত অ্যাপথসে। গত সপ্তাহে শেষ অস্ত্রের চালান এসেছিল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কারমানোভিচ কোরলা হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে। নিজ বাহিনীপ্রধান ও ঘাঁটিপ্রধানকে বন্দী করে সে। অনুগত কিছু অফিসার-সৈনিকের সাহায্যে এক জাহাজ অস্ত্র এবং ঘাঁটি দখল করে নেয়।

বিপদ বুঝে পালিয়ে আসে এরা, অপেক্ষায় আছে ঘাঁটি মুক্ত করার। কিন্তু পারছে না অস্ত্রের অভাবে।

পাশের ঘরে নিয়ে এল ওদের সোফিয়া। সাথে যেলেনিকা, হেস ও বিরো। বাইরে বেশ কিছু সশস্ত্র লোক ঘোরাঘুরি করছে। কেউ সামরিক উর্দি পরা, কেউ সাধারণ পোশাক। পরের দল মুক্তিযোদ্ধা। এখানে আসার পথে সর্বত্র এদের দেখেছে ও। সারা গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সংখ্যায় এরা প্রচুর, কিন্তু অস্ত্র নেই তেমন। যা আছে তা দিয়ে এক ঘণ্টাও টেকা যাবে না যদি কোরলা বাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধ বাধে।

ঘরটার চারদিকে তাকাল রানা। এটাও পাথরের, তবে সিলিং বেশ নিচু। প্রথম রূমে ডাইনিং টেবিলে খেল ওরা পাঁচজন। পাঁউরুটি-*গোভেদিনা* (গরুর মাংস), স্টেক, প্রচুর শাক-সবজি, সালাদ এবং সবশেষে *তুর্সকা কাভা* নামে টার্কিশ কফি। খাওয়া শেষ হতে টেবিল পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল যেলেনিকা ও লেফটেন্যান্ট বিরো। চেয়ার খানিকটা পিছিয়ে নিয়ে বসল রানা, সিগারেট ধরাল ক্যাপ্টেনকে অফার করে। 'এবার সব খুলে বলো,' বলল ও সোফিয়াকে।

'তোমাদের বিশ্রাম প্রয়োজন, রানা।'

'পরে হলেও চলবে। আগে খুলে বলো সব। কর্নেল কোরলা কেন এ কাজ করল।'

'টাকার লোভে।'

'আচ্ছা।'

'এই গ্রামে মায়া নামে এক সার্ব মেয়ে থাকত। অল্পবয়সী এবং খুবই সুন্দরী। তার সাথে কোরলার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। মেয়ে আর মদ, এই দুটোর ওপর ভীষণ দুর্বলতা কোরলার, হাই-কমান্ডও জানত সে কথা।'

'তারপর?'

'সেই মেয়েটির ওখানে আনাগোনা ছিল তার অনেকদিন থেকে, প্রায়ই সময়-অসময়ে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে আসত সে বিনা অনুমতিতে। দু'বার তাকে ওয়ার্নিং দিয়েছে তোমার বন্ধু, কানেই তোলেনি।'

'যুদ্ধ বেধে যাওয়ার পরও ছিল মেয়েটি?' নড়ে বসল রানা।

ওপর-নিচে মাথা দোলাল সোফিয়া। 'ছিল,' ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেসকে দেখল মুখ তুলে।

গলা খাঁকারি দিল টেকো। প্রতিধ্বনি করল, 'ছিল। এবং এখনও আছে।'

'কোথায়?' চোখ কোঁচকাল ও।

'ঘাঁটির ভেতরে।'

'আই সী!'

'চীফের ওয়ার্নিং কানে তোলেনি কর্নেল,' বলে চলল হেস। 'বরং নিজের কিছু একান্ত বিশ্বস্ত অফিসারের সাহায্যে গোপনে মায়াকে আজ এখানে, কাল ওখানে লুকিয়ে রেখেছে। চুটিয়ে মৌজ করেছে। সে খবরও যখন ফাঁস হয়ে গেল, নতুন করে চীফের কানে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল, প্রত্যেককে হুমকি দিয়ে বেড়িয়েছে সে। আমাকে পর্যন্ত। কর্নেল ঘাঁটির সেকেন্ড মোস্ট সিনিয়র অফিসার, চীফ বাদে আর সবাই নিচের র‍্যাঙ্কের, তাই আমরা পাত্তা পেতাম না তার কাছে। র‍্যাঙ্কের দাপট সব সময়ই দেখাত কোরলা। তারওপর দলে লোক টানার জন্যে দু'হাতে খরচও করেছে দেদার। পরে জেনেছি টাকা তাকে সার্বরা জুগিয়েছে।'

'বলে যান।'

'মায়ার স্বামী আর দেবর, দু'জনেই ছিল পুলিস বাহিনীতে। স্বামী স্টীভ কাইল ইয়োগোস্লাভ সিক্রেট পুলিস ইউবিডিএ-র সদস্য। পোস্টিং ছিল মস্তারে। খ্রিস্টান বলে যুদ্ধ বাধার পর তারা সার্বিয়া চলে যাবে সিদ্ধান্ত নেয়। মায়ার সাথে কাইলের অনুপস্থিতির সুযোগে কোরলার যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা সে জানত। তাই যাওয়ার সময় স্ত্রীকে ত্যাগ করেই যায় কাইল। পথে ক্রস ফায়ারের মধ্যে পড়ে মারা যায় সে, ছোট ভাই পালিয়ে যায়।

'এর এক, কি দেড় মাস পর আবার অ্যাপথসে দেখা যায় তাকে। স্যথে আরও কারা যেন ছিল, গ্রামবাসীরা তাদের কাউকেই চিনতে পারেনি। সে-ও প্রায় দু'মাস আগের কথা। রাতে এসে রাতেই ফিরে যায় তারা। এসেছিল মায়ার মাধ্যমে কর্নেল কোরলাকে টোপ গেলাতে।' গাল চুলকাল ক্যাপ্টেন হেস।

সিগারেট মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল রানা। হাতের কাজ সেরে আগেই এসে দলে যোগ দিয়েছে যেলেনিকা-বিরো। ওদিকে সামনে বড় এক বাটিতে রাখা কাঠবাদাম চিবুচ্ছে বুরুজ আলি। পাদ্রা হেস ইংরেজিতে বলছে বলে বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছে না তার।

'টোপটা কি?' বলল ও।

'ঘাঁটি দখল করে সার্বদের হাতে তুলে দেয়ার বিনিময়ে নগদ দশ মিলিয়ন ডলার পাবে কোরলা এবং ইওরোপের যে কোন দেশে আজীবন ফ্রী বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদির সুযোগ। ঘাঁটির সাথে জেনারেল ইসমাইলোভিচকেও তুলে দিতে হবে। এক কথায় রাজি হয়ে যায় লোকটা। আমাদের চীফের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশও ছিল তার। কোরলা রেগুলার, তারই ঘাঁটির ইনচার্জ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হাই কমান্ড তার চরিত্রের কথা জানত বলে যুদ্ধকালীন সময়ে সে ঝুঁকি নেয়নি, তার বদলে এক্স ব্রিগেডিয়ার সুলেমানোভিচকে চীফ করে পাঠায়। কোরলার বিশ্বাস, জেনারেল তাঁর জামাইকে পদটা দিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ তার ধারণা ভুল। এ ব্যাপারে জেনারেলের কোন হাত ছিল না।' সিগারেট ফেলে দিল ক্যাপ্টেন। বুকে হাত বেঁধে বসল।

'প্রতিশোধ নেয়াও হবে, তার সাথে এতবড় প্রাপ্তি, তাই চট্ করে রাজি হয়ে যায় কোরলা। ঝাল ভাল করে ঝাড়ার জন্যে ব্রিগেডিয়ারকেও আটক করে।'

'জেনারেলকে নিয়ে কি করবে সার্বরা?'

'কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর থেকে একযোগে ওদের ওপর পাল্টা হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর। আক্রমণের সমস্ত খুঁটিনাটিও প্রায় রেডি তবে কোন্ কোন্ সেক্টরে হামলা করা হবে, জেনারেল ছাড়া আর কেউ তা এখনও জানে না। সারায়েভো থেকে এ খবর লীক হয়েছে। বেলগ্রেড খুব দুশ্চিন্তায় আছে তা নিয়ে। তাই ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে তাঁকে ঠেকাতে। সে বন্দী করে হোক, বা হত্যা করেই হোক।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। চিন্তিত। 'কোরলাকে সার্বরা কি প্রস্তাব দিয়েছে, আপনারা তা জেনেছেন কি করে?'

'যেদিন জেটিতে বিদ্রোহ করে সে, সেদিনই সন্ধের পর এদিকের পরিস্থিতি জানতে এসেছিল মায়ার দেবর। গোপনে খবর পেয়ে তাকে আটক করি আমরা। মারের মুখে ফাঁস করে দিয়েছে সে। কিন্তু ততক্ষণে কাজ হয়ে গেছে। ওদিকে জেনারেল-ব্রিগেডিয়ারকে বন্দী করে ফেলেছে কোরলা। আর তার অনুগতরা এদিকে ঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। পালিয়ে আসা ছাড়া আমাদের পথ ছিল না।' এক মুঠো বাদাম তুলে নিল টেকো। একটা একটা করে ছুঁড়ে দিতে থাকল মুখের মধ্যে।

'ওঁদের এখনও ঘাঁটিতেই রাখা হয়েছে?' কানের লতি চুলকাল রানা।

'হ্যাঁ। দলে আমরা অনেক। উপযুক্ত অস্ত্র পেলে...'

'আজ রাতেই পৌঁছে যাবে অস্ত্র,' বলে সোফিয়ার দিকে ফিরল ও। 'কিন্তু তুমি তো সারায়েভো ছিলে, এখানে কবে এলে? কেন?'

কিছুটা উদাস দেখাল তাকে। 'যেদিন দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিন ছিল আমাদের ম্যারেজ ডে। তোমার বন্ধুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না বলে আগের দিন আমিই চলে আসি যেলেনিকাকে নিয়ে।'

'ঘাঁটি থেকে বের হলে কি করে?'

'বাইরেই ছিলাম আমরা। লেফটেন্যান্ট বিরো আমাদের দু'বোনকে গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাতে নিয়ে এসেছিল।'

কিছু সময় ভাবল রানা। তারপর টেকো ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল। 'রাতে অস্ত্র পৌঁছবে, শিপ আনলোড করার জন্যে প্রয়োজনীয় মানুষ জোগাড় করুন।'

টাকের মত মুখটাও ঝলমল করে উঠল তার। 'শিওর!'

'ঘাঁটির একটা ম্যাপ জোগাড় করে দিন আমাকে। না থাকলে কাগজে এঁকে দিন।'

'আর?'

পকেট থেকে মলিন ম্যাপটা বের করে টেবিলে বিছাল রানা। জাহাজ কোথায় ভিড়বে, কি ভাবে গগলের সাথে যোগাযোগ করতে হবে, ইত্যাদি বলে গেল একনাগাড়ে। ঘণ্টাখানেক পর শেষ হলো বৈঠক।

উঠে পড়ল ক্যাপ্টেন। 'দুপুরের পর রওনা হব আমরা। তাহলে রাত থাকতে ফিরে আসা যাবে।'

'আপনারা ফিরলে বাকি আলোচনা হবে।' উঠে আড়মোড়া ভাঙল রানা। একটু বিশ্রাম না নিলে আর পারা যাচ্ছে না।

ছয়

দু'দিন আগের কথা। আড্রিয়াটিকের ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়ার সীমান্ত বরাবর একটু বাইরের দিকে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ। মানুষের বসতি নেই, তবে দিনের বেলা জেলেরা থাকে। মাছ ধরতে আসে ওরা। সন্ধের আগেই ফিরে যায়।

ওর মধ্যে বড়সড় এক দ্বীপ—ওপুযেন। সেদিন বিকেলের দিকে দ্বীপের জেলেরা ঘাবড়ে গেল হঠাৎ করে ওখানে বড় বড় চারটে গানবোট হাজির হতে দেখে। ওদের কাজ প্রায় শেষ তখন, জাল শুকোতে দিয়েছে রোদে। একটু পর বাড়ির পথ ধরবে। ক্রোয়েশিয়ান, বসনিয়ান, সবাই আছে ওর মধ্যে। জাহাজগুলোকে ঘুরে এমুখো হতে দেখে ঘাবড়ে গেল লোকগুলো।

সামনের জাহাজ থেকে বুল হর্নের সাহায্যে কষে দাবড়ি লাগানো হলো জেলেদের, তক্ষুণি ভেগে যেতে বলা হলো। ব্যস্ত হয়ে ভেজা-আধভেজা জাল গোটাতে শুরু করল তারা। কাজের ফাঁকে ভয়ে ভয়ে জাহাজগুলোর দিকে তাকাচ্ছে। বুঝতে পারছে না ওগুলো কাদের। বোঝার উপায় নেই, কারণ আইডেন্টিফিকেশন মার্ক রং স্প্রে করে ঢেকে ফেলা হয়েছে ওগুলোর।

পনেরো মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল ওপুযেন। যন্ত্রচালিত ট্রলার চালিয়ে যার যার উপকূলের দিকে ছুট লাগাল জেলেরা। নোঙর ফেলে অবস্থান নিল গানবোট। খবর হয়ে গেল, সতর্ক হয়ে উঠল ক্রোয়াট ও বসনিয়ান নৌ-বাহিনী। কিন্তু ওপুযেনে রহস্যময় গানবোটগুলোর অবস্থান বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কেন কে জানে, সন্ধের আগেই হুড়োহুড়ি করে নোঙর তুলল ওগুলো। মুখ ঘুরিয়ে সোজা খোলা সাগরের দিকে ছুটল—চারটে চারদিকে। দেখতে দেখতে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। কেন ওগুলো

এল, কেনই বা চলে গেল, কিছুই বোঝা গেল না।

লীডিং শিপের ফোরডেকে দাঁড়িয়ে হাসছে তখন বহরের অধিনায়ক, সার্ব নৌ-বাহিনীর কমান্ডার পোলগার মিলান। চোখ মেলে সে তখন পদোন্নতি, মেডেল, উর্ধ্বতন অফিসারদের বাহ্‌বার স্বপ্ন দেখছে।

বিশেষ এক দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছে সে। তার সাথে রয়েছে শ' তিনেক দুর্ধর্ষ সার্ব নৌ-কমান্ডোর এক বাহিনী। অ্যাপথস ঘাঁটি দখল করবে। রাতের আঁধারে হেঁটে ওখানে পৌঁছার কথা তার দলবলসহ। এক বিশ্বাসঘাতক বসনিয়ান কর্নেলের হাত থেকে ঘাঁটির দায়িত্ব বুঝে নেয়ার কথা।

তবে আপাতত সে পরিকল্পনা পিছিয়ে দিতে হয়েছে তাকে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে। দুপুরের দিকে খবর এসেছে, বড় বড় চারটে রহস্যময় জাহাজ উদয় হয়েছে অ্যাড্রিয়াটিকে। ওগুলোর গন্তব্য জানা যায়নি। হাই কমান্ডের ধারণা ওগুলোয় বসনিয়ানদের জন্যে অস্ত্র আসছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। বেলগ্রেডের নির্দেশে তাই জাহাজগুলোকে পাকড়াও করতে চলেছে মিলান। অ্যাপথস দু'দিন পরে দখল করলেও চলবে, আগে ওদের ঠেকানো জরুরী। মুসলিম বাহিনীর হাতে নতুন অস্ত্র পড়তে দেয়া চলবে না।

বেচারা কল্পনাও করেনি এই দৌড় তার তিনদিনেও শেষ হবে না। বেলগ্রেডের নির্দেশে বারবার এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে সেদিক ছুটে বেড়াতে থাকল সে হন্যে কুকুরের মত। দেখাই নেই রহস্যময় জাহাজগুলোর। হাই কমান্ডের এখন এক নির্দেশ, একটু পরই আরেক নির্দেশ অনুসরণ করতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা কমান্ডারের। স্বপ্ন কখন যে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে, এখন আর খেয়াল নেই।

চতুর্থ দিন বিকেলে এল আরেক নতুন নির্দেশ—সবগুলো বোটকে আলবেনিয়ার দুরাজো পোর্টের দিকে যেতে হবে। ওখানে মাঝসাগরে বড় বোট থেকে ছোট ছোট বোট-ট্রলারে বোঝাই হয়ে দুবরোভনিক যাবে অস্ত্রশস্ত্র।

কনফার্মড নিউজ। কাজেই লম্বা দৌড় শুরু করল পোলগার মিলানের নৌ-বহর। দু'দিন পণ্ডশ্রম করে যখন ফিরল সে, তার একদিন আগেই জায়গামত পৌঁছে গেছে ভিনসেন্ট গগলের মাল। খালাস হয়ে অ্যাপথস পৌঁছেও গেছে।

মন ভার করে ওপুযেন ফিরে এল কমান্ডার। সেখানে নিজেদের এক টহল জাহাজের ক্যাপ্টেন জানাল, যেদিন দুরাজো রওনা হয়ে যায় সে, সেদিন রাতেই অজ্ঞাতপরিচয় এক লাইট এয়ারক্র্যাফ্‌ট এসেছিল। খুব সম্ভব প্যারা ড্রপ্‌ করে গেছে কাছেই কোথাও। দিনারিক আলপসের দিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজও এসেছে। দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল মিলানের। ইচ্ছে হলো তখনই রওনা দেয় অ্যাপথস, কিন্তু পারেনি। কারণ তখন দিন, সবে দুপুর। সীমান্ত অতিক্রম করার চেষ্টা করলে একজনও বাঁচবে না। অস্থির চিত্তে রাত নামার অপেক্ষায় থাকল সে।

সন্ধে হয়েছে। ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রানা ও লেফটেন্যান্ট বিরো। বুরুজ আলি ক্যাপ্টেন হেসের সাথে দুপুরে চলে গেছে। সোফিয়া ও যেলেনিকা চুপ করে ওদের কাজ দেখছে। রানা গম্ভীর, কপালে চিন্তার কুঞ্চন। অনেকক্ষণ পর চোখ তুলল ও।

'দুই গেট ছাড়া ঢোকার কোন উপায়ই নেই?'

'না।' সোজা হয়ে বসল বিরো। রানার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। 'গেট দিয়েই ঢুকতে হবে।'

'গার্ড পোস্ট কি রকম অ্যালার্ট?'

'খুব একটা নয়, মোটামুটি। কারণ ওরা জানে দু'দু'বার ঘাঁটি মুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েও কাজ হয়নি, কিছুই করতে পারেনি সারায়েভো থেকে আসা বাহিনী। তাছাড়া কোরলার কাছে খুব পাওয়ারফুল ওয়্যারলেস আছে, ঝামেলা দেখলে মেসেজ পাঠালেই পৌঁছে যাবে সার্ব এয়ারফোর্স। ওদের প্রায় সবই অত্যাধুনিক মিগ, আমাদের এয়ারফোর্স ওদের শক্তির তুলনায় কিছুই নয়। তারওপর আমরা যারা আছি, তাদের হিসেবের মধ্যেই ধরে না ওরা। জানে আমাদের লড়াই করার মত কিছুই নেই। তাই খুব একটা গরজ করে না।'

'গেট সব সময় বন্ধ থাকে?' সিগারেট ধরাল রানা।

'হ্যাঁ, সব সময়।'

'কোরলা বের হয় না?'

'নাহ্! বের হওয়ার দরকার কি তার? যার জন্যে আসা, সে তো এখন ভেতরেই আছে। তবে একটা ব্যাপারে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে আমার।'

'কি?' ম্যাপে নজর রেখে বলল রানা।

'ভাবছি সে তো তার কাজ সেরে ফেলেছে, কিন্তু সার্বরা কেন আসছে না ঘাঁটির দখল নিতে? কাইলের ভাই বলেছিল কোরলার কাজ শেষ হলেই আসবে তারা।'

খেয়াল করল না ও। কি করে ঘাঁটিতে ঢোকা যায়, তার উপায় বের করার চিন্তায় ডুবে আছে। চোখ নেচে বেড়াচ্ছে ম্যাপের ওপর। ঘাঁটির ভেতরের ম্যাপ ওটা, ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেসে এঁকে দিয়ে গেছে। যে ঘরে জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারকে আটকে রাখা হয়েছে, সেটা ঘাঁটির মূল ভবনের পাশেই। সমতল ছাদের ছোট এক ভবন, পাথরের তৈরি।

ওটার শ'খানেক গজ দূরে আরেক বিল্ডিং, একটু বড় এটা। ঘাঁটি ইন-চার্জের রেসিডেন্স। সবার ধারণা, এখানেই আছে এখন বিশ্বাসঘাতক কোরলা ও তার প্রেমিকা।

ছবিটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল রানা। ম্যাপ পকেটে ভরে সিগারেট ধরাল। 'গেট দুটো নিজ চোখে দেখতে চাই আমি।'

'বেশ,' একটু ভেবে বলল বিরো। 'কখন যেতে চান?'

'এখনই।'

ঝুঁকে এল সোফিয়া। 'আরও পরে গেলে হত না? রাস্তায় মানুষজন আছে এখন, অসুবিধে হতে পারে।'

'বরং সুবিধে হবে,' বলল ও। 'স্থানীয়দের মাঝে মিশে নিরাপদে কাজ সেরে ফিরতে পারব আমরা।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

বিরো বলল, 'দুটো গেটই দেখতে চান?'

'নিশ্চই!'

'ইজান প্রান্তের গেট এখান থেকে কাছেই, পনেরো-বিশ মিনিটে পৌঁছে যাওয়া যাবে। কিন্তু মূল গেটে পৌঁছতে ঘন্টাতিনেক লাগবে।'

'লাগুক। ওরা ফিরে আসার আগে কাজটা সেরে রাখতে হবে।' মুখ তুলে হাসল রানা। 'যেলেনিকা, তোমার সুন্দর হাতের কফি খেতে ইচ্ছে করছে খুব। বাই দ্যা ওয়ে, কোনটায় ভাল তুমি, লেখাপড়ায়, ঘরের কাজে, না রাইফেল চালনায়?'

লাজুক হেসে চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটি। সোফিয়া মুখ খুলল তার হয়ে। 'জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই জানি, দেখেও আসছি, স্বাধীনতার জন্যে যুগ যুগ ধরে লড়ছে আমাদের জাতি। তাই রাইফেল চালানোর কাজটা আমরা সবাই কম-বেশি ভালই জানি। তবে ও লেখাপড়ায় বেশি ভাল। হার্ভার্ডে পিএইচডি করছে শিল্পকলার ওপর। বেচারী! ছুটিতে দেশে বেড়াতে এসে ফেঁসে গেল। এক সেমিস্টার মিস্ করল।'

'হার্ড লাক,' আনমনে মন্তব্য করল রানা।

'যাক্‌গে! শুধু কফি, না আরও কিছু খাবে?'

'শুধু কফি। বিরো, বের হওয়ার জন্যে সাধারণ এক সেট পোশাক চাই আমার।'

'জোগাড় করে আনছি আমি।' উঠে পড়ল লেফটেন্যান্ট, তার সাথে যেলেনিকাও বেরিয়ে গেল।

ওরা দু'জন বসে থাকল নীরবে। যার যার চিন্তায় ডুবে থাকল কিছু সময়। সোফিয়া কথা বলে উঠল প্রথম। 'রানা, ওই ভারী গেট কি করে খোলার কথা ভাবছ তুমি?'

'এখনও শিওর নই। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না, একটা পথ ঠিকই বের করে ফেলব।'

সশব্দে দম ছাড়ল সোফিয়া। 'আমি না চাইলেই কি দুশ্চিন্তা রেহাই দেবে আমাকে? এদিকে এই অবস্থা, ওদিকে ছেলে-মেয়ে দুটো সারায়েভোয় রয়েছে। ওদের দেখাশুনার তেমন কেউ নেই। কে জানে কি অবস্থা ওদের!'

'এরমধ্যে যোগাযোগ হয়নি ওদের সাথে?' বলল রানা।

'তা হয়েছে,' আঙুল ভাঁজ করে নখ পরীক্ষা করতে লাগল সোফিয়া। 'আমাদের কথা ভেবে খুব উদ্বিগ্ন দু'জনেই।'

মাথা দোলাল ও। 'স্বাভাবিক।' সিগারেট ধরিয়ে পর পর কয়েকটা টান দিল। 'আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।'

'সেই বিশ্বাস নিয়েই আছি এখনও, রানা। একেক সময় খুব ভয় হয়, যদি কোনমতে একবার অ্যাপথসের দখল নিতে পারে সার্বরা, সর্বনাশ হয়ে যাবে। এমনিতে ইজান-অ্যাপথস মিষ্টি পানির জায়গা। মেটকোভিচও। ভুট্টা-আঙুর ইত্যাদি প্রচুর ফলে এসব জায়গায়। প্রতিবছর প্রচুর টাকার কাঠ বিক্রি করে এসব অঞ্চলের মানুষ। যদি ওরা এগুলোর ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে পারে কোনমতে, আলাদা করে ফেলতে পারে বসনিয়া থেকে...'

হেসে উঠল রানা, থেমে গেল সোফিয়া বাধা পেয়ে। 'কল্পনায় অনেক দূরে চলে গেছ তুমি,' বলল ও। 'এসবের কিছুই ঘটবে না শেষ পর্যন্ত। অ্যাপথসও আবার তোমাদের হবে।'

'আমি বিশেষ ভরসা রাখতে পারছি না। সার্বরা এখনও পর্যন্ত কেন আসছে না বুঝতে পারছি না আমরা, তবে যে কোন মুহূর্তে যে এসে পড়বে, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ভয় হচ্ছে মাল নিয়ে ওরা ফেরার আগেই যদি...'

'আসবে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বাধা দিল রানা। 'আসতে পারবে না।'

বিস্মিত চোখে দেখল ওকে সোফিয়া। 'কি করে নিশ্চিত হলে?'

রহস্যময় এক টুকরো হাসি হেসে কষে টান দিল সিগারেটে।

ওর দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠল সোফিয়া। ঝুঁকে এল। 'প্লীজ, রানা! বলো কি করে নিশ্চিত হলে তুমি?'

'তুমি কি ভুলে গেলে, কিছুদিন আগেও বেলগ্রেডে আমার এজেন্সির নেটওঅর্ক ছিল? কিয়েরযেক তার চীফ ছিল?' মিটিমিটি হাসছে রানা।

'নিশ্চই না!' দ্রুত কয়েকবার মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু তার সাথে এর কি সম্পর্ক, তা তো...'

'এবং সেখানে যত এজেন্ট কাজ করত, তারা প্রায় সবাই কিয়েরযেকের ঘনিষ্ঠ? হাই, লো, সব লেভেলের এজেন্ট ছিল ওর মধ্যে?'

'হ্যাঁ, জানি,' কপালের কুঞ্চন আরও ঘন হলো সোফিয়ার। 'তো?'

'ওয়েল,' শ্রাগ করল রানা। 'অফিস নেই বটে, কিন্তু লোকগুলো আজও আমার পে-স্কেলে লিস্টেড আছে। এখনও নিয়মিত বেতন পায় তারা, আমাদের হয়ে কাজ করে। তোমার লোক লন্ডনে আমার সাথে দেখা করার পর আমিও ওদের কারও কারও সাথে যোগাযোগ করেছি। অ্যাপথসের ব্যাপারে সার্বদের পরিকল্পনার কথা তারাই জানিয়েছে। ওরা কোন পথে আসবে, এখনও কেন আসছে না, আমি জানি, সোফিয়া। এ-ও জানি, ওদের এখানে পৌঁছতে কম করেও আরও দু'দিন লাগবে।' সিগারেট ফেলে হীল দিয়ে পিষে দিল ও।

'ওরা আসবে, এবং অকাতরে মরবে। কারণ ততক্ষণে অ্যাপথস আবার তোমাদের হয়ে যাবে।'

চরম বিস্ময়ে অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না সোফিয়া। তাকিয়ে থাকল অনড় হয়ে। 'ওরা...ওরা কোন্ পথে, মানে...'

'সাগরপথে আসবে ওরা। ইন ফ্যাক্ট, এসেও গেছে।' আবারও হাসি ফুটল রানার মুখে। 'তবে ব্যস্ত আছে। এখনই কূলে নামার উপায় নেই।'

'কেন!'

ফোঁস করে দম ছাড়ল রানা। 'বড্ড নাছোড়বান্দা তুমি, সোফিয়া।'

'প্লীজ, রানা, বলো! কেন নামতে পারছে না ওরা, কি অসুবিধে?'

'ওরা খবর পেয়েছে, অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকটা জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে এই অঞ্চলের দিকে আসছে। সেগুলোকে ধাওয়া করার কাজে ব্যস্ত ওরা।'

ভুরু সামান্য ওপরে উঠল সোফিয়ার। 'আসলে কোন জাহাজ নেই?'

'আছে। তবে ওগুলোকে ধরা সার্ব গানবোটের কম্ম নয়।'

'অর্থাৎ ওরা জানতেও পারছে না আসলে কি আছে ওগুলোয়।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

হেসে উঠল সোফিয়া। 'সার্বরা জাহাজগুলোর খোঁজ কিভাবে পেল, সেটাও নিশ্চই অজ্ঞাত?'

'হান্ড্রেড পার সেন্ট।'

কফি নিয়ে এল যেলেনিকা। একটু পর বিরো ফিরল এক সেট মলিন শার্ট-প্যান্ট ও শত তালি দেয়া একজোড়া জুতো নিয়ে। সবই বড় হলো রানার। তবু পরতে হলো। কফি খেয়ে আধ ঘণ্টা পর বের হলো রানা ও বিরো। ন'টার মত বাজে তখন। বলতে গেলে সবে সন্ধে উতরেছে। লোকজন আছে রাস্তায়, দোকানে-বাজারে টুকটাক কেনাকাটা চলছে। তবে হাসি নেই কারও মুখে। সবাই চিন্তিত। মেশিনের মত কাজ করছে।

ইঁটের ওপর ঢালাই করা রাস্তা। বেশিরভাগ জায়গায় ঢালাই ক্ষয়ে ইঁট বেরিয়ে আছে, ঘাস, লতাপাতা গজিয়েছে ফাঁকে। রাস্তায় আলো একটা আছে তো পাঁচটা নেই। বাড়িঘর প্রাচীন, রোমানদের আমলের। ইঁট আর কংক্রিটের। প্রতিটা বিল্ডিঙের নিচতলা *তাবেরনি* বা ছোট ছোট দোকানের উপযুক্ত করে তৈরি। কোমর সমান উচ্চতায় হিঞ্জে বসানো কাঠের ঝাঁপ, খোলে নিচের দিকে। কাউন্টার হিসেবে ব্যবহার হয় ওগুলো। পুরো শহরটাই বাজার বলতে গেলে।

চারতলার ওপরে কোন ভবন নেই। ওপরের ফ্লোরগুলো ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট। সামনে বারান্দা আছে। সিঁড়ি বাইরের দিকে। টালির ছাদ। কাঠের ঘরও আছে বেশি কিছু। সব মিলিয়ে হতচ্ছাড়া গোছের এক শহর।

রাস্তায় পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই বেশি। কালো বোরখায় আপাদমস্তক ঢাকা তাদের। আসছে, দ্রুত কেনাকাটা সেরে ফিরে যাচ্ছে। শহর কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে খিলানওয়ালা উঁচু এক ভবনের ওপর চোখ পড়ল রানার। কঙ্কালের মত শুধু খুঁটিগুলো দাঁড়িয়ে আছে ওটার।

'কি ছিল ওটা?' জানতে চাইল রানা।

'এখানকার *ভিজিলাস*।'

'টাউন মেয়রের অফিস?'

'আসলে সামরিক শাসকের। সম্রাট ডাইওক্লেটিয়ানের সময় গড়ে ওঠে এই শহর। প্রাদেশিক গভর্নর থাকত তখন সপ্লিটে। এখন সেটা ক্রোয়েশিয়ায় পড়েছে। সে আমলে এটা ছিল এক মাইনর ফ্রন্টিয়ার আউটপোস্ট। *ভিজিলাস* খুদে এক গ্যারিসন পরিচালনা করত এখান থেকে।'

'আচ্ছা।'

'স্লেভদেরও ট্রেনিং দেয়া হত এখানে। রোমের কলোসিয়ামে লড়াই করার জন্যে গ্ল্যাডিয়েটর হিসেবে তৈরি করা হত তাদের।' একটু বিরতি দিল সে। 'মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে রাখা হত স্লেভদের। আজও আছে সেসব। বেশিরভাগ এখানেই মরত, অন্যরা মরত রোমের কলোসিয়ামে।'

'এখানেও তো কলোসিয়াম আছে,' বলল রানা। 'ফাইট হত না এখানে?'

'হত। তবে কম।' থেমে এদিক-ওদিক দেখে নিল লেফটেন্যান্ট। 'এদিকে

মানুষজন কম, রাস্তা ছেড়ে নেমে গেলে ভাল হত।'

'চলুন।'

খানিক পর দাঁড়িয়ে পড়ল যুবক। হাত তুলল সামনের দিকে। 'ওই যে।'

নাইটগ্লাস চোখে লাগিয়ে তাকাল রানা। কম করেও বিশ বাই ত্রিশ হবে গেটটা। পুরু লোহার তৈরি। ভেতর থেকে বন্ধ। ওটার দিকে পিছন ফিরে আছে দুটো টি-৩৪। ওগুলোর সামনে, পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মাঝারি ট্রুপ ক্যারিয়ার। ছাদে ফিট্ করা আছে হেভি মেশিনগান। দুদিকে বালির বস্তা দিয়ে ঘেরা দুটো গান এমপ্লেসমেন্টও আছে। বারো থেকে পনেরোজন সৈনিক আছে গেটে, এখানে-ওখানে দু'জন-তিনজন করে জটলা করছে। সিগারেট টানছে। ঢিলেঢালা ভাব।

ওদের মধ্যে ছয়জনকে দেখা গেল কালো ইউনিফর্ম পরা। ওরা ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের। ক্যারিয়ারের ওপর দাঁড়ানো মেশিনগানারকে খুব সতর্ক মনে হলো। ইস্তানমুখী রাস্তার দিকে কড়া নজর তার। গেট থেকে প্রায় পাঁচশো গজ রাস্তা ও তার দু'পাশ আলোকিত করে রাখা হয়েছে চার-পাঁচটা ফ্লাড লাইটের সাহায্যে। গেটে পৌঁছতে হলে ওই আলোর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। আত্মগোপন করে এগোবার উপায় নেই।

তাতে অবশ্য বিশেষ কিছু আসবে-যাবে না, নিজেকে বলল রানা। নিজের পিঠ চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হলো ওর অস্ত্র তালিকায় বুদ্ধি করে শূটারসহ বিশেষ এক ধরনের স্মোক বম্বের কথা লিখেছিল বলে। জিনিসটা প্রয়োজন হবে ভাবেনি রানা। তবু লিখেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে ওটাই সবচেয়ে বেশি জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে।

'চলুন, এবার সামনের দিকে যাওয়া যাক,' নাইটগ্লাস নামিয়ে বলল ও। 'এদিকের কাজ শেষ।'

সামনের গেটের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও একইরকম। তবে এখানে সৈন্য সংখ্যা বেশি—বিশ পঁচিশজন সব মিলিয়ে। 'কি বুঝলেন, মিস্টার রানা?' ফেরার পথে প্রশ্ন করল লেফটেন্যান্ট।

'কোরলার সৈন্য সংখ্যা কত?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল ও। অন্যমনস্ক ছিল বলে খেয়াল করেনি বিরোর প্রশ্ন।

'খুব বেশি হলে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন,' বলে আপনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ, এরকমই হবে মোটামুটি।'

'তার মানে অর্ধেকেরও বেশি থাকে বাইরে?'

'হ্যাঁ।'

ভোর চারটের একটু পর আখড়ায় ফিরে এল ওরা। ততক্ষণে ছোট দুই পিক আপ ভ্যান বোঝাই অস্ত্র পৌঁছে গেছে। বাকি মাল পথে রয়েছে জানা গেল। আলো ফোটার একটু আগে শেষ চালানসহ পৌঁছল ক্যাপ্টেন হেস, বুরুজ আলি ও ভিনসেন্ট গগল। তেমনি সুটেড-বুটেড রয়েছে ইটালিয়ান, অবশ্য এবারেরটার রং কালো। হাতে ছড়ি নেই, তবে দাঁতের ফাঁকে চুরুট আছে।

'হ্যালো, রানা!' হাত বাড়াল সে, হ্যান্ডশেক করল রানার সাথে।

'হ্যালো!'

'মিলিয়ে দেখে নাও তোমার জিনিসপত্র সব এসেছে কি না।'

'প্রয়োজন নেই। আমি জানি এসেছে।'

ঘরের মেঝেতে স্তূপ করে রাখা ঝকঝকে, অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সোফিয়া ও তার ছোট বোন। পলক পড়ছে না কারও চোখে। পিস্তল-রিভলভার থেকে শোল্ডার বোর্ন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রকেট লঞ্চার, সবই আছে ওর মধ্যে। 'সোফিয়া, এ হচ্ছে আমার আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ভিনসেন্ট গগল। এখানে যা কিছু দেখছ, সব ও বিনামূল্যে দান করেছে তোমাদের ন্যায়যুদ্ধে নিজের...'

'আহ্!' বাধা দিয়ে সোফিয়ার দিকে এগোল গগল। 'বেশি কথা বলো তুমি।' সোফিয়ার বাড়ানো হাতের উল্টোপিঠে চুমু খেল। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, সেনিয়রিটা।'

'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না,' আবেগ মাখা গলায় বলল সে। 'এত টাকার জিনিস...'

'ভাষা খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন নেই,' সুন্দর করে হাসল গগল। 'তারচেয়ে বরং কষ্ট করে কড়া এক কাপ কফি খাওয়ান। দু'রাত ভয়ে চোখের পাতা এক করতে পারিনি। চোখ মেলে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছে।'

মহাব্যস্ত হয়ে উঠল সোফিয়া। 'নিশ্চই, নিশ্চই! ওহ্, এ হচ্ছে আমার ছোট বোন, যেলেনিকা।'

আরেকবার হাত বাড়াল ইটালিয়ান। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ টু, সেনিয়রা।'

পনেরো মিনিট পর, ডাইনিং টেবিলে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছে রানা-গগল এবং সোফিয়া-যেলেনিকা। হেস, বুরুজ আলি ও বিরো কফি তাড়াতাড়ি শেষ করে কাজে লেগে পড়েছে। সঙ্গে আরও কয়েকজন আছে। অস্ত্র-গোলাবারুদ বাছাই করে সাজিয়ে রাখছে ওরা। বাতাসে ভাসছে নানান ধাতব ও গান্অয়েলের গন্ধ।

'পথে কোন অসুবিধে হয়নি তো?' জানতে চাইল রানা।

মাথা দোলাল গগল। 'একদম না। একেবারে মাখনের মধ্যে গরম ছুরির মত সোজা চালিয়ে এসেছি।' থেমে কিছু ভাবল সে। 'বুরুজ আলির মুখে তোমাদের বিপদের কথা শুনলাম। সত্যি, বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছ এবার, রানা।'

'তোমার প্লেন ফিরেছে তো নিরাপদে?'

'হ্যাঁ। ওদের কোন অসুবিধে হয়নি। সময় থাকতে চম্পট দিয়েছিল।'

এক ঘণ্টা পর হাতের কাজ সেরে টেবিলে এসে বসল ওরা তিনজন। ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেস ও লেফটেন্যান্ট বিরোর মুখে হাসি ধরে না। থেকে থেকে হেসে উঠছে তারা কারণে অকারণে। টগবগ করে ফুটছে। পারলে যেন এখনই ছোটে ঘাঁটি পুনরুদ্ধার করতে।

'এইবার কোরলাকে দেখাব বিশ্বাসঘাতকতার ফল কি হয়,' দাঁতে দাঁত চেপে আনমনে বলে উঠল ক্যাপ্টেন। মৃদু ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলে।

নীরবে হাসল রানা। 'এখন বিশ্রাম করুন গিয়ে। দুপুরে আপনাদের সবাইকে পুরো ফর্মে চাই আমি। বুরুজ আলি, তুমিও ঘুম দাও গিয়ে।'

'জ্বে।'

'ক্যাপ্টেন!' হেসের দিকে ঘুরল রানা।

'বলুন, মিস্টার রানা।'

'চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করুন। গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে কাক-পাখিও যেন এদিকে ঘেঁষতে না পারে।'

'নিশ্চই!'

'আর ত্রিশজন বাছাই করা যোদ্ধা জোগাড় করুন। দুপুরের পর তাদের নিয়ে বসব আমরা।'

'কেমন বুঝছ, রানা?' চুরুট ধরিয়ে জানতে চাইল গগল। 'ঘাঁটির গেটে গার্ড ব্যবস্থা কি রকম মনে হলো?'

সংক্ষেপে বলল ও। চুমুক দিল দ্বিতীয় কাপ কফিতে। জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছে। এইমাত্র সূর্য উঠেছে। কিন্তু হালকা মেঘের কারণে আলো ফুটতে পারছে না ঠিকমত। আর সবাই ঘুমাতে চলে গেছে। সোফিয়া যায়নি।

'কিভাবে কাজটা করবে ঠিক করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ। প্রায়।'

'কোনদিক থেকে কাজ শুরু করবে?'

'দু'দিক থেকেই, একযোগে,' বলল রানা। 'প্রথম চোটেই ওদের ভড়কে দিতে হবে। নইলে কঠিন হবে কাজ উদ্ধার করা।'

মাথা দোলাল গগল। 'ঠিক। দু'দিক থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু হলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে ওরা।' হাসল সে। 'কখন শুরু করতে চাও?'

'সন্ধের পর।' কফিতে চুমুক দিল ও। 'গার্ডদের মধ্যে বেশ ঢিলে-ঢালা ভাব দেখলাম কাল রাতে। অর্থাৎ পলাতক সৈনিকদের হিসেবের মধ্যে ধরছে না ওরা। আশা করছি অপ্রস্তুত অবস্থায় ব্যাটারা বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না আমাদের সাথে। অন্তত গেটে।'

'গেট তো ভেঙে ঢুকতে হবে, তাই না?' জানতে চাইল সোফিয়া।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অবশ্যই।'

'বোমার সাহায্যে?'

'হ্যাঁ।'

'বিস্ফোরণের শব্দে ভেতরের সবাই অ্যালার্ট হয়ে যাবে না?' প্রশ্ন করল ইটালিয়ান।

'যাবে।'

'হুঁম!' গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'তার মানে ভেতরে অনেক কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে।'

মৃদু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'যতটা তুমি ভাবছ, ততটা কঠিন না-ও হতে পারে।'

'কি বলছ? তা হয় কি করে?'

হাসি আরও চওড়া হলো রানার। 'সময় হোক, নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

ওর দেখাদেখি গগলও হাসল না বুঝে। 'কি হলো, হাসছ যে?'

'এমনি।'

'কামন, রানা, রহস্যটা কি? একসঙ্গে দুই গেটে হামলা হলে বাইরের গার্ডদের অবস্থা যা-ই হোক, ভেতরের সবাই নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবে। তখন ওদের প্রতিরোধ কঠিন না হয়ে...'

'এত অস্থির হচ্ছ কেন?' বলল ও। 'বলেছি তো সময় হলেই দেখতে পাবে। আমরা যে গেট দিয়ে ঢুকব, সেদিকে আমাদের প্রতিরোধ করার মত বিশেষ কেউ থাকবে না।'

চোখ কুঁচকে রানাকে দেখতে থাকল গগল। সোফিয়া নড়ে বসল। 'তা কি করে সম্ভব, রানা?'

কফি শেষ করে চোখ ডলল ও। হাই তুলল। 'উঠতে হয় এবার। একটু ঘুমিয়ে না নিলে চলছে না।' ওদের দু'জনকে নীরবে উত্তরের অপেক্ষায় থাকতে দেখে হাসি দমন করা কঠিন হয়ে উঠল। 'একটু ধৈর্য ধরো। দুপুরের পর সব জানতে পারবে তোমরা।'

'বেশ,' মাথা ঝাঁকাল গগল।

দুপুরের খানিক পর বসল ওদের সভা। মাসুদ রানার নির্দেশে ত্রিশজন বাছাই করা যোদ্ধা জোগাড় করেছে পাদ্রা হেস। তাদের অবশ্য প্রথমেই ডাকা হয়নি, ঘরের বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে লোকগুলো। গল্প-গুজব করছে, সিগারেট টানছে।

ওদিকে ভেতরে শুরু হয়ে গেছে সভার কাজ। তাতে উপস্থিত রয়েছে রানা, গগল ও বুরুজ আলি, অন্যদিকে হেস-বিরো এবং সোফিয়া-যেলেনিকা। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয়েছে মেয়েরাও অংশ নেবে অভিযানে। সামান্য আপত্তি করেছিল রানা, কিন্তু ধোপে টেকেনি। এক কথা সোফিয়ার, অস্ত্র চালনায় তারা পুরুষদের কারও তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। কাজেই যাচ্ছে তারা সাথে।

বৈঠক শেষ হলো। দুই দলের দুই অধিনায়ক, রানা ও ক্যাপ্টেন হেস নিজেদের হাতঘড়ির সময় মিলিয়ে নিল। এরপর অস্ত্র বিতরণের পালা।

সূর্য ডুবল এক সময়। মাসুদ রানার নেতৃত্বে একদল চড়ে বসল এক পিক্-আপ ভ্যানে। হেলেদুলে রওনা হয়ে গেল সেটা ঘাঁটির প্রধান গেটের উদ্দেশে।

আলো না জ্বেলে এগোচ্ছে ভ্যান। সামনের একমাত্র সীটে ড্রাইভারের পাশে বসেছে সোফিয়া ও যেলেনিকা। লেফটেন্যান্ট বিরো ড্রাইভ করছে। পিছনের ক্যারিয়ারে গাদা-গাদি করে শুয়ে আছে রানা, বুরুজ আলি, গগল এবং তিন দুর্ধর্ষ বসনিয়ান রেগুলার সৈনিক—ভেটভ, শিরপান ও কিরিমভ। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ওদের।

এরা তিনজনই দেখতে একেকটা ছোটখাট দানব। শিরপান আর শিম্পাঞ্জীতে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। প্রশস্ত, ঢালু কাঁধ তার, হাত দুটো অতিরিক্ত দীর্ঘ। চাউনি ঠাণ্ডা, স্থির। পরিষ্কার খুনীর দৃষ্টি। ছয় ফুটের ওপরে লম্বা। দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই—বাইশ থেকে ত্রিশ, যে কোন একটা হতে পারে।

ভেটভ একটু খাটো, তবে প্রস্থে পুষিয়ে গেছে সেটা। সারাদেহ বনমানুষের মত লালচে রোমে ঢাকা। কুতকুতে চোখ। লোকটা যখন হাসে, আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায় চোখ। বিকট লাগে তখন দেখতে। ত্রিশের মত বয়স ভেটভের। কিরিমভ

হালকা-পাতলা গড়নের। ইন্টেলেকচুয়ালদের মত চেহারা, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি জ্বলে। কথা খুব কম বলে, যেটুকু বলে, হিসেব করে মেপে বলে।

ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেসের বাছাই করা যোদ্ধাদের মধ্যে এই তিনজনের অল্পবিস্তর কমান্ডো ট্রেনিং নেয়া আছে বলে এদের সঙ্গে এনেছে রানা।

হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে ভ্যান। গতি ধীর। একে হেডলাইট অফ, তারওপর আকাশে চলছে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। সম্পূর্ণ অনুমানের ওপর গাড়ি চালাচ্ছে বিরো। যে সব জায়গায় মানুষের আনাগোনা, সেসব সযত্নে এড়িয়ে এল সে, এক সময় খুদে শহর পিছনে রেখে বেরিয়ে এল। আস্তানা ছেড়ে একটানা পনেরো মিনিট এগিয়ে থেমে দাঁড়াল বিরো। জানালা দিয়ে মুখ বের করে পিছনে তাকাল। 'এবার উঠে বসতে পারেন,' বলল সে। 'দর্শক গ্যালারি ছেড়ে এসেছি আমরা।'

এক এক করে উঠল সবাই। ত্রিপলটা দলা করে এক পাশে রেখে দিল শিরপান। রানা ও গগল বসল ক্যাবে হেলান দিয়ে। রানার পায়ের কাছে রয়েছে আড়াই ফুট লম্বা, তিন ইঞ্চি ডায়ার পাইপ ধরনের এক গোবেচারা চেহারার জিনিস। ওটা স্মোক বম্ব শূটার। তার পাশে একটা লেটেস্ট মডেলের মিনি উজি মেশিন পিস্তল। রানার ওয়েব জ্যাকেটের পকেটে আছে উজির চারটে এক্সট্রা ম্যাগাজিন, আধ ডজন গ্রেনেড—ব্রিটিশ ফ্র্যাগমেন্টেশন থার্টি সিক্স। আর আছে নিজের প্রিয় ওয়ালথারসহ আরেকটা পিস্তল, ইয়োগোস্লাভ এমএবি-থার্টি।

বুরুজ আলির সাথে আছে সাড়ে তিন ফুট দীর্ঘ আরেক পাইপ—অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান। এছাড়া স্টেন, পিস্তল, গ্রেনেড ইত্যাদি তো রয়েইছে। শিম্পাঞ্জী, বনমানুষ ও ইন্টেলেকচুয়াল, তাদের কাছেও আছে একই জিনিস, তবে অন্য দেশের এবং মডেলের। গগলের আমদানী। তার এবং সামনের তিন আরোহীর সঙ্গে রয়েছে শুধু একটা করে মিনি উজি।

রাস্তা ছেড়ে ঢালু মাঠে নেমে পড়ল ভ্যান, নাগরদোলার মত দুলতে দুলতে ছুটল। গতি খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে বিরো এবার।

মুখ তুলে আকাশ দেখল গগল। 'ঝড়-টড় উঠতে পারে, রানা।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও। বাতাস নিয়েই আসল দুশ্চিন্তা রানার। এ মুহূর্তে একদম থম্ মেরে আছে। আসল সময়ে যদি ঝড় শুরু হয়, ওর আসল অস্ত্র, স্মোক বম্ব কোন কাজে আসবে না। ওগুলো বিশেষ বোমা, যখন বিস্ফোরিত হয়, ভেতর থেকে হালকা ধূসর রঙের ধোঁয়া বের হয় টিয়ার গ্যাসের মত। ওই গ্যাস নাকে গেলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়বে যে কেউ।

কিন্তু জোর বাতাস থাকলে কাজ করবে না ধোঁয়া, উড়ে যাবে। বৃষ্টি যদি শুরু হয়, তাহলে পুরো বরবাদ হয়ে যাবে প্ল্যান। তবু ভরসা একটা আছে রানার, তা হলো ওর আক্রমণের পরিকল্পনা ও ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেসের বাহিনীর তৎপরতা। যদি তাদের অভিযান বাধাহীন এগোতে পারে, ঠিক সময়ে কাজ শুরু করতে পারে ওরা, বিশেষ অসুবিধে হবে না তাহলে।

ওদিকে ওরা রওনা হওয়ার ঠিক এক ঘণ্টা পর নিজের বাহিনী নিয়ে আস্তানা

ত্যাগ করল পাদ্রা হেস। গ্রাম এড়িয়ে বন-বাদাড় ভেঙে নীরবে এগিয়ে চলল পিছনের গেটের দিকে। সামনে হেস, কাঁধে শোল্ডার বোর্ন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান। পিছনে চারজনের কাঁধে চড়ে যাচ্ছে এক হেভি মেশিনগান। সমতল খাটিয়ায় বসে আছে ওটা। তার পিছনে দুই সারিতে এগোচ্ছে অন্যরা—অধিনায়কসহ আটাশজন।

প্রত্যেকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এরা প্রত্যেকে রেগুলার। এতগুলো মানুষ হেঁটে চলেছে, অথচ তেমন কোনও আওয়াজ নেই।

ঘুরপথে আসতে হয়েছে বলে সময় একটু বেশি ব্যয় হলো। পঁচিশ মিনিট পর জায়গামত পৌঁছল দলটা। ফ্লাডলাইটের আলোর অর্ধবৃত্তের বাইরে জড়ো হলো। অধিনায়কের কাছ থেকে যার যার দায়িত্বের নির্দেশ নতুন করে আরেকবার নিল তারা, তারপর ছড়িয়ে পড়ল নিঃশব্দে। আধখানা চাঁদের মত অবস্থান নিল আলোর বৃত্তের বাইরে।

পাকা রাস্তার ওপর বসানো হলো মেশিনগান, ওটা চালানোর জন্যে থাকল দুই গানার। হেস থাকল ওদের সাথে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে সে। অনেক কষ্টে কাটতে লাগল একেকটা মিনিট। যেন কয়েক যুগ পর দশ মিনিট পার হলো।

ফোঁস করে চেপে রাখা দম ছাড়ল ক্যাপ্টেন। যে যার পজিশনে পৌঁছে গেছে এখন, সবাই তৈরি। এখন প্রতীক্ষা কেবল সঠিক সময়ের। ঠিক দশটায় শুরু হবে তার কাজ।

আরও কয়েক যুগ, অর্থাৎ দশ মিনিট বাকি।

ধীরেসুস্থে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গানের ব্রীচে শেল ভরল হেস। ওদিকে গানারের সহকারীও মেশিনগানের ব্রীচে ভরে ফেলেছে পাঁচশো বুলেটের লম্বা বেল্ট।

শুরু হলো রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষার পালা।

ঝড়-বাতাসের খবর নেই। এখনও থম্ মেরে আছে পরিবেশ। প্রকৃতিও যেন কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে। তাই নড়তে সাহস পাচ্ছে না বাতাস, গাছের পাতা ভুলে গেছে দোল খাওয়ার কথা।

আর পাঁচ মিনিট!

সঙ্গীদের অবস্থান দেখে নিল রানা। এদিকেও আলোর বাইরে বসে আছে ওরা। তবে অন্য দলের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয়, এক জায়গায়। উত্তেজনায় ঘামছে সবাই, ঢিব্ ঢিব্, ঢিব্ ঢিব্ করছে বুকের মধ্যে। গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে। মুখ শুকিয়ে কাঠ, মনে হচ্ছে কেউ বুঝি শিরিস কাগজ দিয়ে জিভ-গলা ঘষে দিয়েছে।

স্থির চোখে সামনে তাকিয়ে আছে ওরা। মেইন গেটে গার্ডের সংখ্যা গত রাতের মতই। হাঁটাহাঁটি করছে লোকগুলো। সিগারেট টানছে, পরস্পরের সাথে কথা বলছে এক-আধটা। কিন্তু কারও চেহারায় স্বস্তি আছে বলে মনে হলো না। মনের জোর হারিয়ে ফেলেছে ওরা, ভাবল রানা। আরও দুই-একদিন যদি কাটাতে হয় এই অনিশ্চয়তার মধ্যে, নির্ঘাত পালাবে ব্যাটারা।

দুই মিনিট!

বুরুজ আলিকে উসখুস করতে দেখে ঘুরে তাকাল ও। 'কি হয়েছে?' চাপা গলায় জানতে চাইল। 'কিছু বলবে?'

প্রকাণ্ড মাথাটা দোলাল দানব। মুখে নিষ্পাপ শিশুর হাসি। 'করল্লার দুঃখের কতা চিন্তা করলে কান্দন আয় আমার।'

পলকের জন্যে বিমূঢ় দেখাল রানাকে। তারপরই হেসে উঠল নিঃশব্দে। 'করল্লা নয়, কোরলা।'

'ওই অইলে!' মুখ ঘুরিয়ে সামনে তাকাল সে। বিড় বিড় করে বলল, 'লাউ আর কদু, একই তো!'

ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা। সোফিয়া, যেলেনিকা, গগল আর অন্য তিনজনের নজর সামনে। আবছা আলোয় কালো শার্ট-প্যান্ট পরা দুই বোনকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দুই বাঘিনী যেন শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। গরিলা, শিম্পাঞ্জী ও ইন্টেলেকচুয়াল নির্বিকার।

এক মিনিট!

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো রানার। নোনতা স্বাদে ভরে উঠল মুখের ভেতরটা। গগলের সাথে চোখাচোখি হলো। নিঃশব্দ, অনিশ্চিত হাসি ফুটল ইটালিয়ানের মুখে। আচমকা গেটের দিক থেকে ঘড় ঘড় আওয়াজ ভেসে আসতে চমকে ঘুরে তাকাল সবাই। সামান্য ফাঁক হলো গেট, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একদল সৈনিক।

ধক্ করে উঠল রানার বুকের মধ্যে। মনে হলো কোন অজ্ঞাত কারণে গার্ডের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দিয়েছে বুঝি কোরলা। কিন্তু পরক্ষণে ভুলটা ভাঙল। আসলে পালা বদল হলো। আধ মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে নতুনদের হাতে নিজেদের দায়িত্ব দিয়ে পুরানোরা ঢুকে গেল ভেতরে। বিকট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল গেট।

ত্রিশ সেকেন্ড!

ঝট্ করে বিরোর দিকে তাকাল রানা। 'পিছনের গেটেও এই সময় শিফট্ চেঞ্জ হয়?'

বিহ্বল চেহারা হলো লেফটেন্যান্টের। 'জানি না তো!'

মনে মনে ধুমসে আল্লাকে ডাকতে লাগল রানা। যেন তাই হয়, বলছে ও, যেন তাই হয়। এবং সুযোগটা যেন পুরোপুরি কাজে লাগায় ক্যাপ্টেন হেস। এমন এক অপূর্ব সুযোগ চিনতে যেন ভুল না করে সে। রানা যে প্ল্যান করেছে তাতে ওদের আরও পনেরো মিনিট বসে থাকতে হবে নীরবে, কিছু করার উপায় নেই। করতে গেলে সমস্ত মিশনটাই বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই এখন হেসের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে বসে থাকা ছাড়া পথ নেই।

ভীষণ আফসোস হলো রানার। কে জানত ঠিক এই সময়ই পালাবদল হয় এদের? জানলে হেসকেই এদিকে পাঠাত ও, নিজের দল নিয়ে রানা অবস্থান নিত পিছনের গেটে। যে সুযোগটা মিস হলো, হাজার আফসোসেও তা পূরণ হওয়ার নয়। এক ধাক্কায় কোরলার অর্ধেক লোক ছাঁটাই করে দেয়া যেত অতর্কিত হামলা চালিয়ে।

ওকে আপনমনে মাথা দোলাতে দেখে কাছে এগিয়ে এল গগল। 'কি হলো? মাথা দোলাচ্ছ কেন?'

'বিরাট এক সুযোগ মিস হয়ে গেল,' বলল রানা।

'কি রকম?'

ব্যাখ্যা করল ও। 'আমিও তাই ভাবছি,' রানার বলা শেষ হতে মাথা ঝাঁকাল ইটালিয়ান। 'তবে দুঃখ কোরো না। এখন হোক বা একটু পরে, ঘটনা তো একই ঘটবে।' হাসল লোকটা। 'বলা যায় না, হেস হয়তো সুযোগটা হাত ছাড়া করবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে কয়েক সেকেন্ড আগেই শুরু করে দেবে কাজ।'

জবাব দিল না রানা। ঘড়ির ডায়ালে আঠার মত সেঁটে আছে নজর। লিউমিনাস সেকেন্ডের কাঁটা পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

ঠিক তখনই দূর থেকে ভেসে এল হেভি মেশিনগানের টানা, গম্ভীর হুঙ্কার। দূরাগত ক্যাট্ ক্যাট্ ক্যাট্ ক্যাট্ আওয়াজে বড়রকম ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠল এ প্রান্তের গার্ড বাহিনী।

ওদিকে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে গগলের। রানার পাঁজর সই করে কনুই চালাল সে। 'বলিনি, হেস সুযোগটা মিস নাও করতে পারে?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ও। সেই মুহূর্তে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল সেকেন্ডের কাঁটা—রাত দশটা।

সাত

ঘাঁটির ভেতরে ইন-চার্জের রেসিডেন্স। বেডরুমের এক কোণে এক টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসে আছে দীর্ঘ এক লোক—কর্নেল কারমানোভিচ কোরলা। সামনেই খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এক অয়্যারলেস। আমেরিকান।

কোরলা মধ্যম স্বাস্থ্যের মানুষ। চেহারা সাধারণ, উল্লেখ করার মত কিছু নেই। নাকের নিচে সরু গোঁফ। চুল আর গোঁফের রং এক, মরচে পড়া লোহার মত। চেহারা দেখে এ মুহূর্তে বেশ হতাশ মনে হচ্ছে তাকে। আনমনে কনসোলের আলোটার দিকে তাকিয়ে আছে। মৃদু খড়মড় আওয়াজ করছে সেট। বেশ কিছু সময় পর সচেতন হলো কোরলা, শিথিল ভঙ্গিতে ডান হাত সামনে বাড়াল। তর্জনীর বাইরের প্রান্ত দিয়ে 'ট্রান্সমিট' লেখা বেসবল ব্যাটের মত মাথা মোটা লিভারটা ঠেলে দিল ওপরে। খুট্ করে মৃদু আওয়াজ উঠল, নীরব হয়ে গেল সেট। সবুজ আলো নিভে গেল।

মোনাজাতের ভঙ্গিতে দু'হাতে কয়েকবার মুখ ডলল কারমানোভিচ কোরলা। পাশ ফিরে চেয়ারের ব্যাকে বাঁ হাত রেখে বসল, ডান হাতের কনুই টেবিলে। রুমের মাঝখানের সাটিনের চাদর বিছানো পুরু গদিমোড়া কিং সাইজ খাটের ওপাশে সিঙ্গল সোফায় বসা এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর দিকে তাকাল।

নীল জিনস আর লো কাট্ গলায় সাদা, হাফ হাতা টি শার্ট পরে আছে সে। পায়ের স্লিপার এক পাশে পড়ে আছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে ওপরের পা অল্প অল্প দোলাচ্ছে। রঙচঙে কার্পেট আর জিনসের নীলের পটভূমিতে চমৎকার আকৃতির ফরসা পা দুটো দারুণ দেখাচ্ছে।

এক সময় মেয়েটির নাম ছিল মায়া কাইল। এখন শুধুই মায়া। অপূর্ব, অপূর্ব সুন্দরী। নিখুঁত, চোখা গড়নের নাক-মুখ-ফিগার। থার্টি সিক্স—টোয়েন্টি ফোর—থার্টি সিক্স। প্রায় আইডিয়াল। বয়স চব্বিশের মত। সোনালী চুল ইউ শেপ করে কাটা। লো-কাট শার্টের তলা থেকে তার ফরসা, উদ্ধত বুকের অনেকটাই বেরিয়ে আছে। মাঝের গভীর খাদের দিকে তাকিয়ে আনমনে একটা ঢোক গিলল কোরলা। বর্তমান সমস্যা ভুলে গেছে, মনটা আরেক জগতে পা বাড়াতে চাইছে। তার চোখের তারায় কামনা দেখতে পেল মায়া।

কিন্তু পাত্তা দিল না। হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর করে তুলল। 'কি হলো?' ডান দিকের চুল কানের পিছনে গুঁজল মায়া। 'কি বলল ওরা?'

স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে কঠিন বাস্তবে আছড়ে পড়ল কোরলার মন। 'নাহ্!' তীব্র হতাশা ফুটল চেহারায়। 'আজও আসতে পারছে না কমান্ডার। এখনও ফেরেইনি।'

জিভ দিয়ে চুক্ করে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল মায়া। 'কোনও মানে হয়? কোথায় সে এখন?'

'আগের জায়গাতেই,' চেয়ার ছাড়ল কর্নেল। এগিয়ে এল পায়ে পায়ে। 'কাল ফিরবে।'

'তার মানে কাল আসছে ওরা?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলল।' মায়ার পাশে বসল কোরলা। তার বাঁ হাত তুলে নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। 'ব্যাটা কেন যে এরকম ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

মুখ ঘুরিয়ে তাকে দেখল মায়া। 'জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছি। বলেছে বেলগ্রেডের নির্দেশে,' শ্রাগ করল সে। 'ব্যস্!'

কয়েক মুহূর্ত যার যার চিন্তায় ডুবে থাকল তারা। তারপর উঠল কোরলা। লিকার কেবিনেট থেকে আধবোতল স্মারনফ ভদকা নিয়ে ফিরে এসে বসল আগের জায়গায়। লম্বা এক চুমুক দিল বোতলে। পানের সময় কোন মাত্রা রাখতে শেখেনি কোরলা। মাত্রা কাকে বলে জানেই না। তাই ছোট গ্লাসে, অল্প অল্প চুমুক দেয়ার কথা ভাবতেও পারে না। সরাসরি বোতল থেকে চালান করে পেটে।

'সন্ধে থেকে এ পর্যন্ত অনেক গিলেছ, কোরলা,' মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল মায়া। 'আর খেয়ো না।'

ঠোঁটের কিনারা মুছল লোকটা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে। 'আমি কি করব, বলো? হারামজাদা মিলানই তো টেনশন বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার, আপনা থেকেই বেড়ে যাচ্ছে পানের মাত্রা। চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারছি না।'

'বুঝি। কিন্তু মাতাল হলে তো টেনশন কমবে না। এ মুহূর্তে তোমার বরং মাথা ঠাণ্ডা রাখা উচিত। সতর্ক থাকা উচিত। তোমার ঢিলেমি দেখলে তোমার সৈন্যরাও...'

'আরে না!' বাধা দিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল কর্নেল। 'তা করবে না। ওদের ঢিলেমির জন্যে কিছু যদি ঘটে, ওদের মৃত্যুই যে আগে হবে, তা ওরা বোঝে।' থামল সে। কি ভেবে হেসে উঠল হি হি করে। 'আর হবেই বা কোন্

কচু! মনের দুঃখে বনে-জঙ্গলে কেঁদে বেড়াচ্ছে পাদ্রা, নয়তো সোফিয়া আর তার বোনকে নিয়ে মৌজ করছে ব্যাটারা। কি করবে ওরা আমাদের?'

স্থির চোখে লোকটাকে দেখল মায়া। 'ওদের এতটা অবহেলা করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, কোরলা। আমার ভয় করছে।'

এক হাতে তাকে নিবিড় করে কাছে টেনে নিল সে। 'কোন কারণ নেই ভয়ের, ডার্লিং। এই তো, আর একটা রাত। তারপর অ্যাপথসের দায়িত্ব কমান্ডারের হাতে তুলে দিয়েই তুমি-আমি পগার পার হয়ে যাব। তখন আর কে পায় আমাদের!' সর্বগ্রাসী এক চুমু খেল সে প্রেমিকার লোভনীয় অধরে।

কেন যেন ব্যাপারটা ভাল লাগল না মায়ার, জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে। 'ছাড়ো!'

আপন চিন্তায় ডুবে থাকা কর্নেলের কানে গেল না তার বিরক্তি। আরেক ঢোক ভদকা গিলল সে। 'দু'দিন পর প্যারিস থাকব আমরা। স্বপ্নের প্যারিস। গাড়ি, বাড়ি, টাকা, দুনিয়ার সব হাতের মুঠোয় এসে যাবে আমাদের। তখন বুঝবে জীবন কাকে বলে, আরাম-আয়েশ কাকে বলে!'

'সে যখন হবে তখন দেখা যাবে,' গায়ের ওপর থেকে জোর করে লোকটাকে সরিয়ে দিল মায়া। 'এখন সরো, রাত দশটা বাজতে চলল, খুব খিদে পেয়েছে আমার।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! ডিনার দিতে বলো। আজ একটু তাড়াতাড়ি বিছানায় যেতে চাই।' হাসল সে। 'আজই হয়তো এখানে আমাদের শেষ রাত। একটু ভাল করে সেলিব্রেট করতে হবে।'

কিছু বলল না মায়া। দরজার দিকে পা বাড়াল, বাটলারকে টেবিল লাগাতে বলতে হবে। কিন্তু চার কদম গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ধড়াস্ করে উঠল বুক বাইরে থেকে হেভি মেশিনগানের টানা হুঙ্কার ভেসে আসতে।

ওদিকে কোরলার হাসি জমাট বেঁধে গেল। ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে প্রেমিকার দিকে তাকিয়ে থাকল সে আহাম্মকের মত। হাত থেকে পড়ে গেল স্মারনফের বোতল।

*

ঘাঁটির পিছন গেট। ভেতরের ব্যারাকে রাতের পালার জন্যে তৈরি হচ্ছে কোরলার অনুগত বাহিনী। চোদ্দজনের গার্ড দল, তাদের কমান্ডার এক ক্যাপ্টেন। অফিসার্স মেসে খাওয়া সেরে বেরিয়ে এল সে। ব্যারাকে সবাই রেডি কি না খোঁজ নেয়ার জন্যে এগোল।

মনটা ভার হয়ে আছে। মোটা অঙ্কের টাকার লোভে দেশ-জাতির সাথে বেঈমানী করে কোরলার খাতায় নাম লিখিয়েছে। অথচ টাকার খবর নেই। কবে পাওয়া যাবে, আদৌ পাওয়া যাবে কি না, সেই চিন্তায় আছে ক্যাপ্টেন। কর্নেল কোরলা আরও তিনদিন আগেই তাদের সবাইকে যার যার পাওনা মিটিয়ে দেয়ার ওয়াদা করেছিল। খবর নেই তার। কবে যে পাওয়া যাবে টাকা, আল্লা মালুম।

ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে এখন সবাই, ক্যাপ্টেন জানে। সেনাপ্রধান ও তাঁর জামাই, দু'জনেই অ্যাটম বোমা। ওঁদের আটকে রেখে নিজেদের সবার

প্রাণের ওপর অনেক বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে গেছে। আর ভাল লাগছে না। কখন কোন অঘটন ঘটে যায়, সেই আশঙ্কায় তলে তলে প্রত্যেকে শঙ্কিত। কিন্তু তবু কিছু করার নেই কারও।

আনুগত্য বদল করে নিজেদের তৈরি ফাঁদেই পড়েছে তারা, এখন এ থেকে বের হওয়ারও উপায় নেই। গায়ে সীল পড়ে গেছে। চাইলেও তারা তা করতে পারবে না। ব্যারাকের বারান্দায় পা রাখার আগে কি ভেবে গজ পঞ্চাশেক পিছনের নিঃসঙ্গ ভবনটার দিকে তাকাল সে। মাঝারি আকারের একটা ভবন। এক সময় ঘাঁটির ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার হত।

এখন কয়েদখানা। ওর এক রুমে আটক রাখা হয়েছে জেনারেল ইসমাইলোভিচ ও তাঁর জামাই, ব্রিগেডিয়ার সুলেমানোভিচ কিয়েরযেককে। আরও জনা চল্লিশেক সাধারণ সৈন্যও আটক আছে তাঁদের সাথে। সময়মত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে আহাম্মকগুলো, সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও ঘাঁটি ছেড়ে পালাতে রাজি হয়নি। তার ওপর, কতবড় আস্পর্ধা যে কর্নেল কোরলার বন্দীদের ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে তার অনুগত বাহিনীর ওপর পাল্টা হামলা পর্যন্ত চালিয়ে বসেছিল গাধাগুলো। তাই আটক করা হয়েছে ওদের।

ব্যারাকে ঢুকে পড়ল ক্যাপ্টেন। সবাই তৈরি আছে দেখা গেল। ডাক পড়ার অপেক্ষায় কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে আছে। সিগারেট টানছে, গল্প করছে। ছয়জন আর্টিলারীর কালো ড্রেস পরা, অন্যরা ক্যামোফ্লেজড্। শেষের দলে একজন নেই দেখা গেল। সে এক লেফটেন্যান্ট। তার খোঁজ জানতে চাইল ক্যাপ্টেন, জবাব এল নিজের রুমে আছে সে।

সেদিকে এগোল ক্যাপ্টেন। সাধারণ সৈনিকদের জন্যে পাতা দুই সারি কট অতিক্রম করে ব্যারাকের অন্য প্রান্তে পৌঁছল। পাশাপাশি কবুতরের খোপের মত কয়েকটা রুম আছে এখানে। একটার দরজা খোলা, ভেতরে আলো জ্বলছে। কাছে গিয়ে উঁকি দিল সে। কটে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে লেফটেন্যান্ট। বুট পরা এক পা মাটিতে। আনমনে পা-টা দোলাচ্ছে সে, খসর খসর আওয়াজ উঠছে মেঝেতে।

হাতে একটা বই দেখা যাচ্ছে তার। গভীর মন দিয়ে পড়ছে। ভেতরে ঢুকল ক্যাপ্টেন, তবু খেয়াল নেই ব্যাটার। 'কি করছ, লেফটেন্যান্ট?' গম্ভীর গলায় বলল সে।

তড়াক করে উঠে বসল লেফটেন্যান্ট। একেবারেই অল্পবয়সী। ক্যাপ্টেনের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল, বইটা লুকোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'কি ওটা?'

'একটা বই, স্যার,' ভয়ে ভয়ে বলল সে।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ক'টা বাজে খেয়াল আছে?'

'হ্যাঁ, স্যার! এই তো, এখনই উঠতে যাচ্ছিলাম।'

'কি বই ওটা,' হাত বাড়াল ক্যাপ্টেন। 'দেখি!'

'স্যার, ইয়ে...'

'দেখি!' একই ভঙ্গিতে বলল সে।

বাধ্য হয়ে ওটা এগিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট, যথেষ্ট দ্বিধার সাথে। বইয়ের কভারে

চোখ বোলাল ক্যাপ্টেন। কপাল কুঁচকে উঠল। সার্বো-ক্রোয়াটে অনুবাদ করা জেমস বন্ড সিরিজের বই.ওটা: ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ। আগে এসব নিষিদ্ধ ছিল এ দেশসহ রুশ ব্লকের সব দেশে।

এখন সে সবের বালাই নেই। পশ্চিমাদের যত রাজ্যের পচা নভেল-নাটক, সবই আসে এখন। আসে তো আসে, অনুবাদ হয়ে আসে। আর এইসব আবোল-তাবোল পড়ে ছেলে-ছোকরাদের মাথা বরবাদ হওয়ার দশা।

'এইসব ফালতু জিনিস!' চোখ তুলল ক্যাপ্টেন। 'কবে থেকে পড়া ধরেছ তুমি?'

অনেক দিন থেকে, মনে মনে বলল লেফটেন্যান্ট। 'বেশিদিন না, স্যার। হাতে করার মত কিছু না থাকলে উল্টেপাল্টে দেখি আর কি!'

'কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছিল জেমস বন্ডের পকেটে ঢুকে পড়েছ তুমি।' বইটা তার বেডে ছুঁড়ে মারল সে। 'যতসব রাবিশ! বেরোও, জলদি!' ঘুরে নিজেই বের হয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

যত্নের সাথে ওটা ফের তুলে নিল লেফটেন্যান্ট, ইউনিফর্মের বোতাম খুলে আন্ডারশার্টের তলায় গুঁজে রাখল। ডিউটির সময় সুযোগ হলে শেষ করবে বাকি অংশ। আরও চার-পাঁচটা বই আছে স্টকে, ওগুলো শেষ করতে হবে। জেমস বন্ডে কি মজা, তা তুমি বুঝবে কি করে, শালা! মনে মনে ক্যাপ্টেনের পিণ্ডি চটকাল সে খানিক। বেরিয়ে এল রুমের আলো নিভিয়ে।

দশটা বাজতে দেড় মিনিট বাকি। ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে ইজান প্রান্তের গেটে এসে পৌঁছল চোদ্দজনের দলটা। এন্ট্রিলগে সঠিক সময়সহ সই করল ক্যাপ্টেন। ওদিকে ঘড় ঘড় শব্দে খুলতে শুরু করেছে গেট। সবার আগে ক্যাপ্টেন বাইরে পা রাখল। দশটার আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বাকি।

আচমকা লেফটেন্যান্টের কলজে লাফিয়ে উঠল হেভি মেশিনগানের গুরুগম্ভীর নিনাদ কানে যেতে। দূরে ওটার জোরাল মাযল ফ্ল্যাশও পরিষ্কার দেখতে পেল সে। চোখের সামনে ক্যাপ্টেনসহ আরও কয়েকজনকে উড়ে যেতে দেখে হুঁশ হলো লেফটেন্যান্টের, চট্ করে শুয়ে পড়ল সে। চারদিকের আলো খুব দ্রুত কমে আসছে। ফ্লাড লাইটগুলো চুরমার হয়ে যাচ্ছে গুলির আঘাতে।

আচমকা খুলে গেল ভারী লোহার গেট। তাই দেখে ঠিক রানার মতই আহাম্মক বনে গেল ক্যাপ্টেন পাদ্রা হেস। তবে বেশি সময় স্থায়ী হলো না তার দ্বিধা, ভেতর থেকে নতুন একদল সৈনিক বেরিয়ে আসছে দেখে চট্ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল। বুঝল শিফট চেঞ্জ হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক আইডিয়া এল মাথায়। এদিকে আছে বারো-চোদ্দজন, আরও সমানসংখ্যক এসে যোগ দিয়েছে তাদের সাথে। এই সুযোগটা কেন হাতছাড়া করি? নিজেকে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন। এক ধাক্কায় যদি অন্তত আট-দশজনকেও ফেলে দেয়া যায়, ক্ষতি কি? বরং লাভই তো! তাছাড়া পরে তো একই কাজ করতে হবে। তখন বরং এমন পাখি মারার মত করে কাজ সারা সম্ভব হবে না। মনস্থির করে ফেলল ক্যাপ্টেন।

শোল্ডার বোর্ন অ্যান্টি ট্যাঙ্ক রকেট লাঞ্চার কাঁধে তুলে তাক্ করল একটা ট্যাঙ্ক। বাঁ হাতে গানারকে সামনের ট্রুপ ক্যারিয়ার দেখিয়ে কাজ শুরু করে দেয়ার ইঙ্গিত করল। দুনিয়া কাঁপিয়ে গর্জে উঠল মেশিনগান। ওটার পয়লা ধাক্কাতেই ক্যারিয়ারের ছাদে ফিট্ করা হেভি মেশিনগান ও গানার, দুটোই ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। সাথে ক্যারিয়ারের ক্যাব উইন্ডশীল্ডও গেল।

প্রায় একই সাথে রকেট লঞ্চারের ট্রিগার টেনে দিল ক্যাপ্টেন হেস। মৃদু 'হুপ!' আওয়াজের সাথে বিদ্যুৎবেগে ছুটে গেল ছোট, তবে অত্যন্ত শক্তিশালী বিধ্বংসী গোলা। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল বাঁ দিকের ট্যাঙ্কটা। চোখের পলকে ভুবড়ে গেল ওটার টারেট, দীর্ঘ নল খাড়া উঠে গেল আকাশের দিকে। এবং ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল।

ওদিকে সঙ্কেত পেয়ে তার অন্য সঙ্গীরাও কাজে লেগে পড়েছে। উজি আর অটো-রাইফেলের বিরামহীন হুঙ্কারে থর থর করে কাঁপতে লাগল অ্যাপথস। চারদিকের পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে হাজার গুণ জোরাল হয়ে ফিরে আসছে প্রতিটা গুলির আওয়াজ। গেটের সামনে ততক্ষণে কম করেও আট-দশজন লাশ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অন্যরা মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও সামলে উঠতে চেষ্টা করছে। যে যেদিকে পারে ক্রল করে এগোচ্ছে মরীয়া হয়ে। ওদিকে এক এক করে বিস্ফোরিত হতে শুরু করেছে ঘাঁটির ফ্লাডলাইট। হেসের কয়েক সঙ্গী টার্গেট প্র্যাকটিস করছে ওগুলোকে সই করে।

কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে দ্বিতীয় গোলা বর্ষণ করল হেসের লঞ্চার। ধুলোর মেঘ তখনও ঘিরে রেখেছে প্রথম টি-৩৪ কে। পরের গোলা গোটা টারেট উড়িয়ে নিয়ে গেল ওটার। সন্তুষ্ট হয়ে পরেরটার দিকে নজর দিল সে।

ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে যেন, এমনভাবে কাঁপছে মাটি। মেশিনগান, উজি আর রাইফেলের গুলির ধাক্কায় পাহাড়ের গা থেকে ছোট-বড় নানান সাইজের চল্টা উঠে আসছে, চাক ভাঙা ভিমরুলের মত চারদিকে ছোটাছুটি করছে ওগুলো। কোরলার আহত সহচরদের মরণ চিৎকারে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। সাথে আছে ধোঁয়া ও করডাইটের উৎকট গন্ধ।

তৃতীয় গোলা লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হলো হেসের। সামান্য নিচু হয়ে ট্যাঙ্কের বডিতে আঘাত করল। কেঁপে উঠল কাণ্ডারীবিহীন টি-৩৪, মৃদু আওয়াজ উঠল ট্রেডে, জায়গা ছেড়ে কয়েক ফুট পিছিয়ে গেল ওটা। ধুলো সরে যেতে ছিদ্রটা চোখে পড়ল হেসের, বিশাল এক ফুটো করে ক্যাবের ভেতর ঢুকে পড়েছে রকেট। লাফিয়ে উঠে ছেঁকে ধরল ওটাকে সাদাটে-কমলা রঙের আগুন, উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দিল ট্যাঙ্কের মাথার ওপর।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আরও বেড়ে গেল আগুন, বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো ফুয়েল ট্যাঙ্ক।

আসল দুই বাধা এত সহজে দূর হবে, এতটা আশা করেনি ক্যাপ্টেন হেস। তাই ভারি খুশি সে। দাঁত বেরিয়ে আছে সর্বক্ষণের জন্যে। ট্যাঙ্ক দুটো গেছে, ট্রুপ ক্যারিয়ারটাও মুণ্ডু হারিয়ে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে উজবুকের মত। গার্ডদের একজনেরও দেখা নেই, বেঁচে যাওয়া সবাই আড়াল নিয়েছে।

এমন সময় রাতকে দিন করে ওদের মাথার ওপর জ্বলে উঠল কয়েকটা ফ্লেয়ার। হ্যাজাক লাইটের মত নীলচে জোরাল আলো ছড়াচ্ছে ওগুলো, খুদে আকারের একেকটা প্যারাস্যুটে ভর দিয়ে ধীরগতিতে নেমে আসছে। ফ্লেয়ার নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল হেস, তার নির্দেশে সঙ্গীরা আকাশে টার্গেট প্র্যাকটিস করতে লেগে পড়ল।

আট

মহা হুলস্থূল পড়ে গেল সামনের গার্ডদের মধ্যে। ছোটাছুটি শুরু করে দিল মানুষগুলো। কয়েকজন ছুটে গিয়ে বালির বস্তার ব্যারিয়ারের ওপাশে পজিশন নিল, মুহূর্তে তৈরি হয়ে গেল হেভি মেশিনগান নিয়ে। ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের সৈন্যরা তীর বেগে দৌড়ে গিয়ে ঝপাঝপ্ সেঁধিয়ে গেল ট্যাঙ্কের খোলের নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রস্তুত হলো ও দুটোর বারো পয়েন্ট পাঁচ এমএম মেশিনগান। দীর্ঘ নল নড়েচড়ে স্থির হলো। লক্ষ্য রাস্তার ওপর, মানুষের বুক বরাবর। আর যারা আছে, তারা আশ্রয় নিল ট্যাঙ্ক ও ক্যারিয়ারের পিছনে।

নাইটগ্লাস চোখে লাগিয়ে স্থির হয়ে পড়ে আছে মাসুদ রানা। এক মেজরকে গেটের সঙ্গের গার্ড পোস্টের দিকে ছুটতে দেখল ও। ভেতরের টেলিফোনে চেঁচাতে লাগল সে ভেতরের কারও সাথে। এইমাত্র এ গেটের দায়িত্ব নিয়েছে মানুষটা। পরক্ষণে এই অবস্থা, ভীত আর আতঙ্কিত দেখাচ্ছে তাকে। একেবারে বেহাল।

ব্যাটাদের তোড়জোড় দেখে হাসল রানা। অবশ্য এক মুহূর্ত পরই প্রমাদ গুনতে হলো ওপাশের আকাশে উজ্জ্বল আলোর বন্যা দেখে। ফ্লেয়ার! 'সবাই পিছিয়ে চলো!' মুখ ঘুরিয়ে চাপা গলায় নির্দেশ দিল ও। 'ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দাও। আমি না বলা পর্যন্ত একটা গুলিও ছুঁড়বে না কেউ। মুভ! উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবে সবাই, হারি আপ!'

ক্রল করে পিছিয়ে যেতে শুরু করল দলটা, সবার নজর সামনে। পঞ্চাশ গজমত সরে এসে বড় দেখে তিনটা ঝোপের পিছনে ভাগ ভাগ হয়ে আশ্রয় নিল ওরা। রানা, শিরপান এবং সোফিয়ারা দু'বোন থাকল মাঝের ঝোপের আড়ালে। গগল, বুরুজ আলি ও কিরিমভ বাঁ দিকে, এবং বিরো-ভেটভ ডানদিকের দুই বড় 'মাস্কিয়া' ঝোপের আড়ালে।

খানিক বিরতির পর আবার গোলাগুলি শুরু হলো পিছনের গেটে। বেশ কয়েকটা ফ্লেয়ার টপাটপ্ নিভে গেল। আরও ফ্লেয়ার উঠে দখল করছে মৃতগুলোর জায়গা। অল্পক্ষণের মধ্যেই গোলাগুলির আওয়াজ ও পরিমাণ, দুটোই বেড়ে গেল বহুগুণ। তার মানে নিশ্চয়ই পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে কোরলা বাহিনী। এদিকে গার্ড হাউস থেকে নিচু হয়ে বেরিয়ে এল মেজর, এক ছুটে বাঁ দিকের ব্যারিয়ারের পিছনে চলে গেল। আর দেখা গেল না তাকে। কাউকেই না।

সবাই গা ঢাকা দিয়ে আছে। সম্ভাব্য হামলা ঠেকাবার জন্যে প্রস্তুত। ওদিকে তখন তুমুল চলছে। সবই হেভি মেশিনগান, স্টেন, রাইফেল ইত্যাদির আওয়াজ। মাঝে মধ্যে হেস বাহিনীর ছোঁড়া এক-আধটা গ্রেনেড বিস্ফোরণের আওয়াজও আসছে, তবে ট্যাঙ্কের সাড়া নেই। তার মানে ওগুলো গেছে, সন্তুষ্ট মনে ভাবছে রানা। কাজ একটু আগে শুরু করলেও আসল এবং প্রথম লক্ষ্যের কথা ভোলেনি ক্যাপ্টেন হেস।

নীরবে পড়ে থাকল ওরা। অস্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছে কখন সময় হবে। এদিকে এরা অনড়, ওদিকে গার্ড বাহিনী। ও পক্ষের ধারণা পিছন গেটে যখন হামলা হয়েছে, তখন সামনের গেটে হবেই। কিন্তু মিনিটের পর মিনিট চলে যাচ্ছে, তার কোন আভাসই দেখা যাচ্ছে না।

একটু একটু করে টেনশন কেটে যেতে শুরু করল তাদের, ক্রমে সাহস ফিরে আসতে লাগল। আশ্রয় থেকে গলা বাড়িয়ে উঁকিঝুঁকিও মারছে কেউ কেউ। এরমধ্যে দু'বার গার্ডরুমের ফোন বেজেছে, দু'বারই বুকে হেঁটে গিয়ে ফোন ধরেছে মেজর। খানিক উত্তেজিত গলায় চেঁচামেচি করে ফিরে এসেছে জায়গায়।

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা—বারো মিনিট। নড়ছে না লোকগুলো, এখনও যার যার নিরাপদ আশ্রয়ে বসে আছে। অথচ রানা অন্যরকম আশা করেছিল, আক্রমণ পরিকল্পনাও করেছিল তার ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এখন ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে আশা বিফলে গেছে। সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই। অল রাইট, ভাবল রানা, তাই সই। লঞ্চারে স্মোক বম্ব ভরে তৈরি হলো—আর দু'মিনিট বাকি পনেরো মিনিট পুরো হতে।

বাতাস থম্ মেরে আছে এখনও। ঘন মেঘের আড়ালে থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, জোর নেই সে আলোয়। বের হতে পারছে না মেঘ ভেদ করে।

সামনে নজর দিল ও। এর মধ্যে দু'একজন গার্ড বের হয়ে এসেছে আড়াল ছেড়ে। মেজরও। চোখে নাইটগ্লাস লাগিয়ে এদিকেই নজর বোলাচ্ছে সে। খাটো পাইপটা কাঁধে ঠেকাল রানা, ফোর সাইটে চোখ রেখে গেটের দূরত্ব অনুমান করে রেঞ্জ ফিক্স করল। আর অপেক্ষা করার উপায় নেই। গার্ডরা নড়ুক, না নড়ুক, ওকে সময়মতই শুরু করতে হবে। পিছনদিকে ততক্ষণে ফ্লেয়ারের দাপট কমে এসেছে, তবে মেশিনগান ও অন্যান্য হালকা অস্ত্রের হুঙ্কার সমানে চলছে। একটা-দুটো গ্রেনেডও ফাটছে মাঝেমধ্যে।

'আমি শুরু করতে যাচ্ছি,' অন্যদের উদ্দেশে বলল রানা। 'বুরুজ আলি, রেডি হও।'

'আমি রেডি অইছি কোন্‌কালে,' বলল সে। রকেট লঞ্চার বাঁ দিকের ট্যাঙ্কের টারেট লক্ষ্য করে ধরে বসে আছে। ওগুলোকে প্রথম চোটে ঘায়েল করার মোক্ষম জায়গাই হচ্ছে টারেট।

আর এক মিনিট!

গার্ড থেকে আঙুল সরিয়ে ট্রিগারে রাখল রানা। ঠিক তখনই আবার বেজে উঠল গার্ড পোস্টের টেলিফোন। ছুটে গেল মেজর। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়েও এল। খুব উত্তেজিত। ব্যস্ত কণ্ঠে কি যেন বলতে লাগল। তার ভঙ্গি দেখেই বুঝল

রানা, শেষ পর্যন্ত সত্যিই মেওয়া ফলেছে। আঙুল সরিয়ে নিল ট্রিগার থেকে।

নড়ে উঠল ঘাঁটির মূল গেট, ঘড় ঘড় শব্দে খুলে গেল কয়েক ফুট আন্দাজ। ক্যাপ্টেন হেসের আক্রমণ ঠেকাতে পিছনের ওদের বাড়তি সৈন্যের প্রয়োজন পড়েছে কোরলার। সামনে দিয়ে যখন ভয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, তখন এতজনকে ওখানে বসিয়ে রাখারও প্রয়োজন নেই। তাই ওদিকে যাচ্ছে এরা।

মেজরসহ পাঁচ কি ছয়জন বাদে আর সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল গেট দিয়ে। হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল একটা টি-৩৪। গেট আরও ফাঁক হলো। বাঁ ট্রেডে ভর করে জায়গায় ঘুরল দৈত্যাকার কাঠামোটা, মাটি কাঁপিয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। ফ্লাড লাইটের আবছা আলোয় গগলকে হাসতে দেখল রানা। চোখাচোখি হতে বুড়ো আঙুল তুলে 'ওকে' সঙ্কেত দেখাল সে। গেট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলছে।

শব্দটা কাজে লাগাল রানা। শূটার কাঁধে ঠেকিয়েই ট্রিগার টেনে দিল। নিঃশব্দে ছুটে গেল স্মোক শেল, গেটের সামান্য আগে, পনেরো-বিশ ফুট ওপরে বিস্ফোরিত হলো। আওয়াজ সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেল ঘড়ঘড়ানির তলায়। বিন্দুমাত্র দেরি না করে পর পর আরও দুটো শেল ছুঁড়ল ও। শেষেরটার আওয়াজ হয়তো সামান্য কানে গেছে নিচের ওদের, কিন্তু অন্য ঝামেলায় এতই ব্যস্ত যে খেয়ালই করল না।

ফলাফল দেখার জন্যে যে যার জায়গায় জমে বসে থাকল ওরা। ফ্লাড লাইটের আলোর সীমানার ওপরে বিস্ফোরিত হয়েছে তিনটেই, তাই ধোঁয়া দেখা গেল না প্রথমে কিছু সময়। একটু পর দেখা গেল, বিশাল এক ছাতার মত গোল হয়ে নেমে আসছে। বাতাসের চেয়ে ভারী এ ধোঁয়া, তাই গতি নিম্নমুখী। নামে, তার সাথে বিস্তৃতি লাভ করে।

মেজর ও অন্যদের সিগারেটের ধোঁয়ার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল সে ধোঁয়া। গেট বন্ধ হতে ঘুরে দাঁড়াল মেজর, সঙ্গীদের উদ্দেশে কিছু বলল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ক্যাপ স্পর্শ করল বিষাক্ত গ্যাস। টলে উঠল মেজর, কপালের দু'পাশ চেপে ধরে মাথা ঝাঁকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হলো না পুরোপুরি। এক হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। ভাঙাচোরা ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

দ্রুত এগিয়ে এল অন্যরা, প্রত্যেকে বিস্মিত। এর মধ্যে তাদের ওপরও শুরু হয়ে গেছে গ্যাসের ক্রিয়া। কেউ ঠিকমত কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক এক করে ঢলে পড়তে থাকল লোকগুলো। মোট ছয়জন। একজন আরেকজনের ওপর পড়ে থাকল স্তূপ হয়ে। সমস্ত নড়াচড়া স্তব্ধ হয়ে গেছে অ্যাপথসের মূল প্রবেশ পথের।

এক মিনিট পর নীরবতা ভাঙল বুরুজ আলি। আড়াল ছেড়ে উঠে পড়ল সে। 'জিগাইয়া দেহি আর কেউ আছে কিনা।' রানা মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাতে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে। হাঁক ছাড়ল মুখের সামনে দু'হাত জড়ো করে।

'ও মেয়া সাইবেরা! আর কেউ আছেন বারিতে?'

জবাব নেই। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি খেয়ে ফিরে এল তার হাঁক। গেটের কাছে কোন নড়াচড়াও দেখা গেল না।

'বোঝা গেছে, নেই কেউ,' উঠে পড়ল মাসুদ রানা। 'চলো সবাই।'

এমনি সময়ে বাতাস ছাড়ল। বেশ জোর বাতাস। সাথে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। গাছের পাতায় টুপ্ টাপ্ আওয়াজ তুলছে। এক মিনিটের মধ্যে থেমে গেল বৃষ্টি, ওরা এর মধ্যে গেটের অনেক কাছে পৌঁছে গেছে। বুরুজ আলি গেট ওড়াবার আয়োজনে ব্যস্ত, বাঁ কাঁধের ঝোলা হাতড়ে দুটো শেপড্ চার্জ বের করে ফেলেছে। হাঁটার মধ্যে ওগুলোর ফিউজ চেক করে দেখছে সে।

'ওগুলোর প্রয়োজন নেই,' বলে উঠল রানা। 'ভরে রাখো ব্যাগে।'

গেট না উড়িয়ে কি করে ঢুকবে, আগেই তা ঠিক করে ফেলেছে ও। সোজা অবশিষ্ট ট্যাঙ্কটার সামনে এসে দাঁড়াল। জোর বাতাসে ধুলো উড়ছে। বড় ফোঁটার বৃষ্টি থেমে গেছে, যে কোন মুহূর্তে ফের শুরু হয়ে যাবে মুষল ধারায়। বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল রানা। গগল, মেয়েদের নিয়ে ট্যাঙ্কে উঠে পড়ো তুমি, কুইক! বুরুজ আলি, বিরো, তোমরা ট্রুপ ক্যারিয়ারে ওঠো। বিরো থাকবে হেভি মেশিনগানের দায়িত্বে, তুমি চালাবে। ভেটিভ, কিরিমভ, শিরূপান পিছনে উঠে পড়ো। ফলো করো আমাকে।'

কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়াল ও। ট্যাঙ্কের খোলা হ্যাচওয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে দেখল ইটালিয়ানকে। খোলে ঢুকে হ্যাচ বন্ধ করে দিল রানা। চালকের আসনে বসে পড়ল। গগল বসল মেশিনগানারের সীটে। ব্যস্ত হাতে ওটার ব্রীচ মেকানিজম চেক করতে লাগল। ক্যাব সীটে পাশাপাশি বসা দুই বোনকে দেখল রানা, মুখে সুনিশ্চিত আশ্বাসের হাসি। 'চললাম।'

সামনের খুদে ড্যাশ প্যানেলের দিকে নজর দিল। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভর্তি। কামানের ব্রীচে পঁয়ত্রিশ এমএম গোলা একটা ভরাই আছে, ওদিকে শেলর‍্যাকও বোঝাই। ইগনিশন ধরে মোচড় দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট নিল চমৎকার সার্ভিসিং করা এঞ্জিন। খানিকটা সামনে চালিয়ে ওটাকে রাস্তায় তুলে আনল ও, তারপর রিভার্স গিয়ার দিয়ে পূর্ণ গতিতে পিছনে ছোটাল। খানিক পর ঝাঁকি খেল টি-৩৪, গেটের সাথে ঠেকতেই গতি পড়ে এল মুহূর্তের জন্যে, এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গম্ভীর হয়ে উঠল।

দুই কি তিন সেকেন্ড, তারপরই একদিকের গেটের সবগুলো হিঞ্জ মট্ মট্ শব্দে ভেঙে গেল। আবার গতি পেল ট্যাঙ্ক। থেমে খানিকটা সামনে গিয়েই ফের রিভার্স করল রানা, সবেগে আছড়ে পড়ল গিয়ে গেটের ওপর। কয়েক টন ওজনের প্রকাণ্ড দুই ভারী লোহার গেট ভেঙেচুরে ভেতরে ঢুকে গেল টি-৩৪। চারদিক কাঁপিয়ে ভয়াবহ শব্দে আছড়ে পড়ল পাল্লা দুটো।

বাঁ হাতের ঝাপ্টায় হেড লাইট জেলে দিল রানা, ডান ট্রেড নিউট্রাল করে বাঁ ট্রেডে শিফট করল পাওয়ার, চরকির মত ঘুরে গেল ট্যাঙ্ক জায়গায়। পরক্ষণে জোর এক দোল খেয়ে সামনে ছুটল অমোঘ নিয়তির মত। চালকের সামনে আড়াআড়ি বসানো ছোট্ট গ্লাস প্যানেল দেখে এগোচ্ছে রানা।

যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সামনে একেবারে ফাঁকা, কেউ নেই ওদের বাধা দেয়ার। সবাই পিছনের গেট ঠেকাতে ব্যস্ত, এদিকের কথা চিন্তা করার সময় নেই। নির্ভয়ে ফরোয়ার্ড হ্যাচ খুলে মাথা জাগাল রানা, পিছনে তাকাল। বড়জোর দশ গজ পিছনে রয়েছে ক্যারিয়ার। ক্যাবের ওপরে সেট করা মেশিনগানের পিছনে

লেফটেন্যান্ট বিরোর কাঠামো দেখা যাচ্ছে।

আচমকা জোর এক দোল খেল টি-৩৪, রানার মুহূর্তের অসাবধানতার সুযোগে বড় এক গর্তে পড়েছিল রাইট ট্রেড। সামনে নজর দিল রানা। সোজা ছুটল কয়েদখানার দিকে। ওদের সামনে, বাঁ দিকে সেই কলোসিয়াম, তার পাশে আর্মি ব্যারাক, গ্যারেজ ইত্যাদি। সব ফাঁকা। ডানে হেলিপ্যাড। পিছনের গেটে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। কতখানি শক্ত বাধার মুখে পড়েছে ক্যাপ্টেন হেস, অনুমান করার চেষ্টা করল রানা।

কয়েদখানার ঠিক সামনে ব্রেক কষল ও। 'বেরোও সবাই!' কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল হ্যাচ গলে।

হুড়মুড় করে অনুসরণ করল ওকে গগল, সোফিয়া ও যেলেনিকা। অস্ত্র বাগিয়ে দুই সারিতে ছুটল ওরা ভবনটার দিকে। ভেতরে একটা-দুটো আলো জ্বলছে, আর সব অন্ধকার। একটু পর সশব্দে ব্রেক কষল ট্রুপ ক্যারিয়ার, ধুপ ধাপ শব্দে লাফিয়ে নেমে পড়ল বুরুজ আলি ও অন্যরা। রানার নির্দেশে ঘাঁটি ইন-চার্জের ভবনের দিকে এগোল দৌড়ে।

কোন গার্ড নেই এখানে। সামনের দরজায় তালা মারা। মিনি উজির সিঙ্গল শটে তালা উড়িয়ে দিল মাসুদ রানা, লাথি মেরে খুলে ফেলল দরজা। সামনেই প্রশস্ত করিডর, দু'পাশে বেশ কয়েকটা দরজা। সব বন্ধ। তবে মাত্র দুটোয় তালা মারা। তার প্রথমটার সামনে থামল রানা। 'ভেতরে কেউ আছেন?'

জবাব নেই। তবে ভেতরে একাধিক কণ্ঠের ফিসফিসানি বেশ পরিষ্কার শোনা গেল। 'সাড়া দিন,' আবার বলল ও। 'আমরা রেসকিউ পার্টি, আপনাদের মুক্ত করতে এসেছি।'

একসাথে চার-পাঁচটা গলা হাউমাউ করে উঠল এবার। কি বলল বোঝা গেল না কিছুই।

'জেনারেল ইসমাইলোভিচ আছেন ভেতরে? ব্রিগেডিয়ার কিয়েরযেক?'

'ওঁরা পাশের রুমে,' একটাই কণ্ঠ বলে উঠল এবার। 'আমাদের···আমাদের বের করুন দয়া করে।'

গগলকে তালা ভাঙার ইঙ্গিত করে পাশের তালা মারা দরজার দিকে পা বাড়াল রানা। 'কিয়েরযেক! আমি রানা। তুমি ভেতরে?'

'কে?' আবেগে কাঁপা গলায় বলল ব্রিগেডিয়ার। গলা শুনেই বোঝা যায় বিশ্বাস করেনি সে। 'রানা?'

আর কিছু শোনার প্রয়োজন মনে করল না ও। 'দরজার কাছ থেকে সরে যাও, আমি তালায় গুলি করছি।'

'ওকে, রানা।'

পর পর দুটো গুলির শব্দ হলো। গগল ও রানা প্রায় একই সাথে গুলি করেছে। পিছনে অনেকগুলো কণ্ঠের নানান বিস্ময়ধ্বনি শোনা গেল। হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসছে সৈন্যরা। তাকাল না রানা, সোফিয়ার হাত ধরে ঢুকে পড়ল পাশের রুমে।

ঘরের মাঝখানে অনড় দাঁড়িয়ে আছে ব্রিগেডিয়ার কিয়েরযেক। দৃষ্টিতে তার রাজ্যের অবিশ্বাস। রানার প্রায় সমান সে দৈর্ঘ্যে, তবে আরও তাগড়া। চোখের

নিচে কালি তার, গালে কয়েকদিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওদের দু'জনকে দেখছে তো দেখছেই সে।

তার পাশেই দাঁড়িয়ে জেনারেল স্টানিস্লাভ ইসমাইলোভিচ। একটু খাটো। বয়স ষাটের কম নয়। দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে কর্তৃত্বের ভাব ফুটে বেরোচ্ছে তাঁর।

দু'পা এগোল ব্রিগেডিয়ার। আরেকবার রানা ও সোফিয়াকে দেখল। ওদের পিছনে বড়সড় এক ভিড় জমে গেছে, সেদিকেও তাকাল। 'রানা!' আরেক পা এগোল কিয়েরযেক, আবেগে গলা কেঁপে গেল। 'সত্যি তুমি এসেছ! কিন্তু…'

রানাও এগোল বন্ধুর সাথে হাত মেলাবার জন্যে। 'দেখতেই পাচ্ছ।'

'কিন্তু তুমি কি করে…'

বাধা দিল সোফিয়া। 'আমি ওকে খবর দিয়েছিলাম।'

হাত বাড়াল না ব্রিগেডিয়ার। কাছে এসে সজোরে ওকে বুকের সাথে চেপে ধরল। 'ওহ্, রানা! মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'শোনো, কথা পরে। বাইরে লড়াই চলছে, কি অবস্থা কে জানে! আমরা যে এখানে আছি এখনও তা টের পায়নি কোরলার লোকেরা। পেলে…'

'কারা যুদ্ধ করছে ওদের সাথে, রানা?'

'তোমার সৈন্যরা।'

'কিন্তু ওরা অস্ত্র কোথায় পেল?'

'পরে শুনো। এখন চলো।'

দুই বোন ওদিকে বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে। জেনারেল পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাদের মাথায়। রানার তাড়া খেয়ে হুঁশ হলো ওদের। 'হারি আপ! এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না আমাদের।'

পাত্তা দিলেন না বৃদ্ধ। কাছে এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন রানাকে। 'আপনার কথা মেয়ে-জামাইর মুখে শুনেছি। কোনদিন দেখা হবে ভাবিনি। যে উপকার করলেন আজ…'

'কেন লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার!' নিজেকে মুক্ত করার সংগ্রামের ফাঁকে বলল রানা। 'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আসল প্রশংসা সব এর প্রাপ্য।' গগলকে দেখাল ও। 'আমার আরেক বন্ধু, ভিনসেন্ট গগল। সময়মত এ যদি অস্ত্র দিয়ে…'

বাধা দিল গগল, কারণ জানে সহজে থামবে না রানা। চট্ করে ডান হাত বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধের দিকে। 'প্লীজড্ টু মীট ইউ, জেনারেল।'

'মাই প্লেজার।'

ব্রিগেডিয়ারের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্ব সেরে নিল গগল।

পাঁচ মিনিট পর। হতাশ মুখে ফিরে এল পাঁচজনের দলটা। 'কোরলা নেই,' ঘোষণা করল লেফটেন্যান্ট বিরো। 'মেয়েটাও নেই। পালিয়ে গেছে।'

'সে কি! কোনদিক দিয়ে পালাল?' বলল রানা।

'বুঝতে পারছি না। মনে হয় মেইন গেট দিয়েই ভেগেছে। শেডে তার কালো গাড়িটা নেই দেখে এসেছি।'

রানার সাথে চোখাচোখি হলো ঘাঁটি প্রধানের। 'তাহলে ঠিকই পালিয়েছে হারামজাদা। নিশ্চই মেটকোভিচের দিকে গেছে।'

'তাহলে?' বলল গগল।

'ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র বের করা যাক আগে। সবাই মিলে পিছন থেকে হামলা চালালে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া পথ থাকবে না দ্বিতীয় গেটের ব্যাটাদের,' রানা বলল কিয়েরযেকের উদ্দেশে।

'ঠিক বলেছ। অ্যাই, চলো সবাই।'

কয়েদখানা থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এল সবাই। রানার মিনি উজি শোভা পাচ্ছে ব্রিগেডিয়ারের হাতে। রানার হাতে ওর প্রিয় অস্ত্র—ওয়ালথার। পিছনের গেটের যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। গোলাগুলির আওয়াজে কান পাতা দায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে দলটা, এমন সময় আচমকা সামনে থেকে উদয় হলো পিছনের গেটের একটা ট্রুপ ক্যারিয়ার। অনেকবার ফোন করেও মেইন গেটের সাড়া না পেয়ে ওটা এসেছিল ব্যাপার দেখতে। এ মুহূর্তে ফিরে যাচ্ছে দুঃসংবাদ নিয়ে। সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয় সময় পেল না ওদের গ্রুপটা, তার আগেই হুঙ্কার ছেড়ে উঠল ওটার হেভি মেশিনগান। এক ধাক্কায় কিয়েরযেকের আট-দশজন নিরস্ত্র সৈনিক পড়ে গেল। পড়ার আগেই কেউ কেউ স্থির হয়ে গেছে, অন্যরা ছটফট করছে অসহ্য যন্ত্রণায়, গোঙাচ্ছে।

মিছিলের সামনের দিকে ছিল বুরুজ আলি, গাড়ির আলো চোখে পড়ার সাথে সাথে চেঁচিয়ে সবাইকে সতর্ক করল সে। পরমুহূর্তে মাটিতে আছড়ে পড়ে অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গান তুলল, সোজা ক্যারিয়ারের রেডিয়েটর লক্ষ্য করে রকেট ছুঁড়ল। প্রচণ্ড এক ঝাঁকি এবং স্টীল ছেঁড়াখোঁড়ার আওয়াজের সাথে পিছনের দুই পায়ে খাড়া হয়ে গেল ক্যারিয়ার। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল গ্যানার। ওই অবস্থায় পেটের ওপরের অংশে বুরুজ আলির দ্বিতীয় গোলা খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ক্যারিয়ার, আগুন ধরে গেল ওটার ট্যাঙ্কে।

তখনই কান্নার শব্দে সচকিত হলো মাসুদ রানা। ঘুরে তাকিয়েই জমে গেল। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন জেনারেল, পেটের কাছে শার্ট রক্তে লাল হয়ে গেছে। জ্ঞান নেই বৃদ্ধের। তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে দুই মেয়ে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের শিথিল এক হাত মুঠোয় পুরে বসে আছে স্থাণুর মত। চোখে অসহায় চাউনি।

বেকুবের মত চারদিকে তাকাল রানা, মৃত, আধামৃত দেহগুলো দেখল। তারপর দুই লাফে পৌঁছে গেল জেনারেলের কাছে। তাড়াতাড়ি পালস পরীক্ষা করে দেখল। আছে! বেঁচে আছেন জেনারেল! ক্ষত পরীক্ষা করে দেখল ও। পেটে কাছাকাছি দুটো গুলি খেয়েছেন বৃদ্ধ। সর্বনাশ! তার মানে খুব তাড়াতাড়ি এঁর অপারেশন করানো প্রয়োজন, নইলে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু কোথায় করা যায় কাজটা? এরকম মেজর অপারেশন?

'মেটকোভিচে হয়তো সম্ভব হতে পারে, রানা,' যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই বলে উঠল কিয়েরযেক। 'কিন্তু সেখানে নেয়ার উপায় কি?'

'বুরুজ আলি!' কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল রানা। 'জলদি ট্যাঙ্ক নিয়ে এসো।

জেনারেলকে নিয়ে এখনই রওনা হব আমরা।'

'ট্যাঙ্ক নিয়ে?' তাজ্জব হয়ে গেল কিয়েরযেক। সোফিয়া আর যেলেনিকা কান্না ভুলে মুখ তুলল।

'হ্যা। সময় নেই। জলদি কিছু কাপড় জোগাড় করো, জেনারেলের ক্ষত বাঁধতে হবে।'

দশ মিনিটের মধ্যে বাঁধাছাঁদা সেরে অজ্ঞান জেনারেলকে তোলা হলো ট্যাঙ্কে। বুরুজ আলি, গগল ও বিরোও উঠল। বিদায়ের আগে দুই বোনকে বলল রানা, 'ভেব না। তোমাদের বাবা সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন।' ব্রিগেডিয়ারকে বলল, 'তুমি ঘাঁটি সামলাও। বাকি চিন্তা ছেড়ে দাও আমার ওপর।'

পাঁচ মিনিট পর হুড়মুড় করে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে গেল টি-৩৪। সর্বোচ্চ গতিতে ছুটে চলল মেটকোভিচের দিকে।

ততক্ষণে ঘাঁটির অস্ত্র ভাণ্ডারে পৌঁছে গেছে ব্রিগেডিয়ার কিয়েরযেক ও তার সঙ্গীরা।

নয়

তিন ঘণ্টা পর ইজানের উত্তর প্রান্তে পৌঁছল ওরা। রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা, একটা কুকুরও নেই। ঘরবাড়ি ডুবে আছে অন্ধকারে, স্ট্রীট লাইটও সব জ্বলছে না। ভূতুড়ে লাগছে। গ্রামই বলা চলে এটাকে, তবে বাড়িঘর প্রচুর। সব বিরান এখন।

'কিছুদিন আগেও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল ইজান,' আফসোসের সুরে বলল বিরো। কাঁধ ঝাঁকাল। 'কোথায় গেল সে সব!'

কেউ কোন জবাব দিল না। রানা বসে আছে টারেটে, চোখে নাইটগ্লাস, ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। ধুলোবালি মেখে চেহারা হয়েছে যা-তা। ট্যাঙ্কের দুলুনির সাথে তাল রেখে দুলছে। ধুলো উড়িয়ে সগর্জনে ছুটে চলা টি-৩৪ আর টারেটে বসা রানাকে দেখে মনে হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন ছায়াছবির দৃশ্য বুঝি—বিনা বাধায় শত্রু লাইনের দিকে ধেয়ে চলেছে বিজয়ী রানা।

থেমে গেল রানা, সামনে কি যেন দেখল কিছু সময়। 'বিরো, ওদিকে আলো কিসের?' নাইটগ্লাসটা তার হাতে তুলে দিল ও। 'দেখো তো!'

দেখল বিরো টারেট রিমে পিঠ ঠেকিয়ে। 'ওটা রেল স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেনও দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোকোমোটিভ। মনে হচ্ছে ছেড়ে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'কোথায় যাবে ওটা, মেটকোভিচ নিশ্চই?' দ্রুত হিসেব কষতে লেগে গেল ও।

'হ্যাঁ।'

'কয় ঘণ্টার পথ?'

'ঘণ্টা দুয়েকের মত,' ওর বাড়ানো হাতে নাইটগ্লাসটা তুলে দিয়ে বলল বিরো। 'কেন?'

'আর সড়ক পথে কতক্ষণ লাগে?' পিছনে তাকাল রানা। খুব বেশি হলে পাঁচ মাইল পিছনে আছে ওরা, মেজর কোরলার অনুগত বাহিনী। এক লাইনে এগিয়ে আসছে দুই জোড়া হেডলাইট— সামনেরটা জীপ, পরেরটা মাঝারি সাইজের ট্রুপ ক্যারিয়ার। অ্যাপথস ছেড়ে বের হওয়ার পনেরো মিনিট পর ওদের পিছু নিয়েছে ওগুলো। বিরোর নির্দেশে বন-বাদাড় ভেঙে কোনাকুনি এসেছে ওরা, বেপথে, তাই মুক্ত আছে এখনও। নইলে হয়তো অনেক আগেই ধরা পড়ে যেতে হত ওদের হাতে।

'তা চার-সাড়ে চার ঘণ্টার কম নয়।'

'বুঝেছি।' মুহূর্তে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল রানা। ঝুঁকে ভেতরে তাকাল। 'গগল! জেনারেলের অবস্থা কি?'

চোখ তুলল বিধ্বস্ত ইটালিয়ান। ট্যাঙ্কের কালিঝুলি মেখে সার্কাসের ক্লাউনের মত হয়েছে দেখতে। 'বুঝতে পারছি না, রানা। তবে ভাল না। জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষণ নেই। চিন্তা হচ্ছে আমাদের এত পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত মাঠে না মারা যায়।' কোটের আস্তিনে মুখ মুছল সে।

নিঃসাড় জেনারেলের ফ্যাকাসে মুখটা দেখল ও। ইটালিয়ানের কোলে মাথা রেখে পড়ে আছেন—চোখ আধবোজা, সামান্য ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট। দু'হাতে শক্ত করে আগলে ধরে রেখেছে তাঁকে গগল যাতে বেশি দোল না খায় দেহটা। পেটের কাছে রক্তে ভিজে চুপচুপ করছে তাঁর ব্যান্ডেজ।

'সামনেই রেল স্টেশন,' বলল রানা। 'জেনারেলকে ট্রেনে করে মেটকোভিচ নেব ভাবছি। সময় অল্প লাগবে, ওদের ধাওয়ার হাত থেকেও বাঁচা যাবে,' ঘাড়ের ওপর দিয়ে বুড়ো আঙুল বাঁকা করে পিছনটা দেখাল ও।

উঁকি দিয়ে গাড়িগুলো দেখল বুরুজ আলি। মাথা দোলাল। 'হেয়া পারা গেলে তো ভালই অয়। তরাতরি যাওয়া যাইবে।'

চোখে গ্লাস তুলল রানা। 'তাই করা যাক তাহলে।'

বিরোর নির্দেশে লেফট নিউট্রাল করে ডান ট্রেডে পাওয়ার শিফট করল বুরুজ আলি, আচমকা পাক খেয়ে বাঁয়ে ঘুরে গেল ট্যাঙ্ক, ছুটল স্টেশনের দিকে। পাঁচ মিনিট পর শেষ বাঁকটা ঘুরল ওরা, পৌঁছে গেল ডিপোর আলোকিত পাকা চত্বরে। তার আগেই ব্রীচে গোলা পুরে ফেলেছে রানা, ট্যাঙ্কের দীর্ঘ মাযল্ ঘুরিয়ে দিয়েছে স্টেশনের দিকে। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

'বিরো, কুইক!' পিস্তল হাতে লাফিয়ে পড়ল রানা। 'তোমরা অপেক্ষা করো, গগল। অবস্থা বুঝে আসি আগে।'

অস্ত্র বাগিয়ে স্টেশন মাস্টারের অফিসের দিকে ছুটল ওরা। দুটোমাত্র লাইন। প্ল্যাটফর্ম একদম ফাঁকা, মানুষজনের ছায়াও নেই। মাস্টারের অফিসে আলো জ্বলছে। এগোবার ফাঁকে প্ল্যাটফর্মে ঘেঁষা লাইনে অপেক্ষমাণ রেলগাড়িটার দিকে তাকাল ও, তিনটে ঝরঝরে মার্কা ওয়াগন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মান্ধাতা আমলের এক ২-৪-২ স্টীম এঞ্জিন। ওটার দ্বিতীয় বয়লার হাম্প থেকে অলস গতিতে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ধোঁয়া।

গাড়িটার বেশ খানিকটা পিছনে, একই লাইনে একটা ডিজেল এঞ্জিন দাঁড়িয়ে

আছে আবছা অন্ধকারে। একটা ওয়াগন ওটার সাথে। অন্য লাইনে একটা নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটকার।

প্রথম ওয়াগন থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে শুনে থমকে দাঁড়াল রানা। একটা শিশু কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মোটা এক পুরুষ কণ্ঠ ধমকে উঠল চাপা গলায়, কান্না বন্ধ করতে বলছে। আরেক নারীকণ্ঠ মিন্ মিন্ করে বলল কি যেন।

'কি ব্যাপার?' আপনমনে বলল ও। 'কারা ওরা?'

'বুঝতে পারছি না,' ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে বলল বিরো। 'বাচ্চাটা খিদেতে কাঁদছে, সারাদিন কিছু খায়নি নাকি।'

'তুমি ওদিকে দেখো, আমি অফিসে যাচ্ছি।'

দু'জন দু'দিকে ছুটল ওরা। আলোকিত অফিসে ঢুকে অবাক হলো রানা—কেউ নেই। ফাঁকা। অথচ মেঝেতে পড়ে আছে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। স্টেশন মাস্টারের টেবিলে একটা খোলা কলমও আছে। অফিসরুমের শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা দেখে সেদিকে ছুটল ও। দড়াম করে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটা বাথরুম। খালি। আহাম্মক বনে গেল রানা। ব্যাপার কি! এরা সব গেল কোথায়? হঠাৎ পিছনে খুব ক্ষীণ, আতঙ্কিত কান্নার আওয়াজে ঘুরে তাকাল ও। ষাট-সত্তর বছর বয়সী এক ছোটখাট বৃদ্ধ ঠিক ওর পিছনে, দরজার আড়ালে বসে আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে। থরথর করে কাঁপছে লোকটা, মৃত্যুভয়ে দু'চোখ বিস্ফারিত। অস্ত্র হাতে খুনে চেহারার রানাকে ঘুরে তাকাতে দেখে কাঁপুনি-কান্না দুটোই বহুগুণ বেড়ে গেল তার, দু'হাতে মাথা আড়াল করে দেয়ালের সাথে মিশে নেই হতে যেতে চাইল যেন মানুষটা।

'মারবেন না, বাবা! মারবেন না!' অনবরত বলে চলেছে বৃদ্ধ। 'আমি মরে গেলে আমার পঙ্গু বউ না খেয়ে মরবে···কেউ নেই আমার···আপনার বউ বাচ্চার কসম লাগে!'

বুঝল রানা। তাড়াতাড়ি পিস্তল কোমরে গুঁজে লোকটার কাঁধে একটা হাত রাখল। চমকে উঠে মুখ তুলল সে, ওর মুখে মৃদু হাসি দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল কান্না ভুলে।

'মারব না,' ভাঙা ভাঙা সার্বো-ক্রোটেনে বলল রানা, দু'হাত নেড়ে অভয় দিল তাকে। 'আমি ট্রেনের খোঁজে এসেছি। খুব জরুরী কাজে এখনই মেটকোভিচ যেতে হবে আমাদের।'

'অ্যাঁ!' তাড়াতাড়ি চোখ মুছল বৃদ্ধ। 'মেটকোভিচ?'

ছুটন্ত পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল রানা, হাত পৌঁছে গেছে কোমরে। বিরো ঢুকল অফিসরুমে। ওর হাতে উদ্যত স্টেন দেখে ফের আঁতকে উঠল বৃদ্ধ, পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। 'ভয় নেই, আমার লোক,' আরেকবার তাকে অভয় দিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা।

'কই, মিস্টার রানা!' বলল সে, 'দেরি কিসের?'

তাজ্জব হয়ে ওদের দেখল বৃদ্ধ। 'আপনারা কারা?'

'বিরো, এঁকে বোঝাও,' বলল রানা। 'ট্রেনের ড্রাইভার কোথায় জিজ্ঞেস

করো।'

বৃদ্ধের সাথে এক মিনিট কথা বলল যুবক, তার প্রশ্নের জবাবে হড়হড় করে কি কি বলল সে বোঝা গেল না কিছুই। আলাপ শেষ হতে মুখ কালো করে রানার দিকে ফিরল বিরো। 'ট্রেন মেটকোভিচেই যাবে। ইস্তানসহ আশেপাশের পাঁচ-দশটা গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেছে। সার্বদের আক্রমণের ভয়ে পালিয়েছে সবাই। ওরাও পালাচ্ছে,' ইঙ্গিতে গাড়িটা দেখাল সে। 'কিন্তু আমাদের ট্যাঙ্ক আসতে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে ড্রাইভার। আমাদের সার্ব ভেবেছে এরা।'

বিরোকে সমর্থন জানিয়ে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল বৃদ্ধ, চোখের পানি মুছল। 'এই লোক স্টেশন মাস্টার,' বলল যুবক। 'ছাড়ার জন্যে ট্রেন তৈরিই ছিল, কিন্তু ড্রাইভার ব্যাটা...'

'যাহ্!' হতাশ কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তাহলে? ড্রাইভার ছাড়া যাব কি করে?'

ভয়ে ভয়ে বিরোকে দেখল মাস্টার। 'মেটকোভিচ কেন যাচ্ছেন আপনারা?'

'আমাদের সাথে বসনীয় চীফ অভ আর্মি স্টাফ আছেন। উনি আহত। খুব তাড়াতাড়ি চিকিৎসা দরকার তাঁর,' দ্রুত ব্যাখ্যা করল বিরো।

চোখ কপালে উঠল বৃদ্ধের। 'জেনারেল ইসমাইলোভিচ! তিনি না বন্দী...'

'ছিলেন,' বাধা দিল রানা। 'আমরা মুক্ত করে নিয়ে এসেছি।'

'পিছন পিছন শত্রু বাহিনী ছুটে আসছে,' যোগ করল বিরো। 'তাড়াতাড়ি সরে পড়তে না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'হায় হায়!' ব্যস্ত হয়ে উঠল স্টেশন মাস্টার। 'এখন কি করি?' বলতে বলতে অফিস থেকে ছুটে বের হয়ে গেল সে। মুখের সামনে দু'হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে ডাকল কয়েকবার ড্রাইভারের নাম ধরে। সাড়া এল না। অসহায়ের মত ঘুরে তাকাল সে হাল ছেড়ে দিয়ে। 'কোথায় যে গেল!'

'এই এঞ্জিন কি করে চালাতে হয় জানেন?' বলল রানা।

'ওরা কি করে চালায়, দেখেছি। কিন্তু নিজে কখনও...'

'ওতেই চলবে। কুইক, আমাকে দেখিয়ে দিন সিস্টেম।'

বিস্ময় ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'আপনি চালাবেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি!' পা বাড়াল ও এঞ্জিনের দিকে। 'বিরো, ওদের বলো জেনারেলকে ট্রেনে তুলতে। আর রাস্তায় গিয়ে দেখে এসো গাড়িগুলো কতদূরে আছে।'

তীরের মত ছুটল যুবক, দৌড়ের ওপর টারেটে দাঁড়িয়ে থাকা বুরুজ আলিকে খবরটা জানিয়ে মুহূর্তে বাঁকের ওপাশে চলে গেল। সাথে সাথে কাজে লেগে গেল বুরুজ আলি ও গগল। বহু কষ্টে অজ্ঞান বৃদ্ধকে বের করল খোলের ভেতর থেকে। দু'জনে মিলে দেহটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে ট্রেনের দিকে এগোল।

এঞ্জিন থেকে উঁকি দিয়ে ওদের দেখল রানা। 'প্রথম ওয়াগনে তোলো ওঁকে, গগল!'

'ঠিক আছে। কিন্তু ওখানে কি করছ তুমি?'

'আর বোলো না, ড্রাইভার...' কথা শেষ করতে পারল না ও, দুদ্দাড় শব্দে

ফিরে এল।বিরো।

'এসে গেছে ওরা, মিস্টার রানা! এসে গেছে! আর দু'মাইলও হবে না বোধহয়।'

'সেরেছে!' মাথা টেনে নিল ও, তাড়া লাগাল বৃদ্ধ মাস্টারকে। 'জলদি করুন, এসে গেছে ওরা!'

এমনিতেই ভয় পুরো কাটেনি বৃদ্ধ মাস্টারের, তারওপর 'এসে গেছে' শুনে ফের আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। 'হয়েছে কি, রানা?' এঞ্জিনে উঠে এল গগল। 'আর কত দেরি?'

'মুশকিল হয়ে গেছে,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল ও। 'আমাদের ট্যাঙ্ক দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে ড্রাইভার ব্যাটা। কি ভাবে চালাতে হয় এ যন্ত্রণা বুঝতে পারছি না। বহু বছর আগে একবার চালিয়েছি…ভুলে গেছি।'

'সে কথা আগে বলবে তো!' রেগে গেল ইটালিয়ান। 'সরো, দেখতে দাও আমাকে।' সামনের প্যানেলের ছোট-বড় ডায়াল-গুলোয় চোখ বোলাতে শুরু করল সে, থুতনি চুলকাল চিন্তিত মুখে।

'তুমি জানো চালাতে?' এক পাশে দাঁড়িয়ে আশা ভরা চোখে ওর কাজ দেখছে রানা।

'দেখা যাক পারি কি না। স্টীম যথেষ্ট আছে দেখা যাচ্ছে, তবে আরও চাই। রানা, তুমি হেলপ্ করো আমাকে। বেলচা দিয়ে কয়লা ভরতে থাকো।'

তার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই রাস্তার দিক থেকে একটা রাইফেল গর্জে উঠল, রানার মাথার সামান্য ওপরে ক্যাবের পুরু লোহার দেয়ালে 'ঠং' শব্দে বাড়ি খেল ওটা, তারপর ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল উল্টোদিকের দেয়ালে। ঝপ্ করে বসে পড়েছে ওরা গুলির আওয়াজ কানে যাওয়ার সাথে সাথে, তিন-চারবার এ-দেয়াল ও-দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে টুপ্ করে পায়ের কাছে পড়ল বুলেটটা চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে।

এক সেকেন্ড পরই এল দ্বিতীয় বুলেট। 'এসে গেছে শালারা!' বলেই ব্রেক লিভার লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল গগল, রিভার্স বার এক ঝট্কায় সামনে ঠেলে দিয়ে ব্রেক রিলিজ করল, এবং একই সাথে থ্রটল টেনে নিয়ে এল পিছনে। জমা স্টীমের আচমকা জোর চাপে লাইনের ওপর জোরাল ঘটাং ঘটাং শব্দে খুব দ্রুত কয়েকটা পাক খেল ভারী হুইলগুলো, বিকট শব্দে স্টীম রিলিজ করল বয়লার হাম্প, ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল আকাশ।

কেঁপে উঠে হেলেদুলে রওনা হলো লোকোমোটিভ ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ তুলে। সন্ত্রস্ত মাস্টারকে মেঝে থেকে টেনে তুলল রানা। 'নেমে পড়ুন। এখনও সময় আছে, পালান!'

হামা দিয়ে স্টেশনের প্রবেশপথের দিকে তাকাল সে ভয়ে ভয়ে। বেশ আলো হয়ে গেছে জায়গাটা, প্রায় এসে পড়েছে ওরা। 'জলদি!' তাড়া লাগাল ও আবার। 'বাথরুমে গিয়ে ঢুকবেন না যেন, একদম সরে পড়ুন স্টেশন থেকে।'

রানার পরের কথা লোকটা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। উল্টো দিক দিয়ে প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়েই অফিস বিল্ডিঙের অন্ধকার কোণের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল, নেই হয়ে গেল মুহূর্তে। ট্রেনের গতি একটু একটু করে বাড়ছে। গলা

সামান্য বের করে পিছনদিক ফিরে বুরুজ আলির নাম ধরে হাঁক ছাড়ল রানা।

'আমরা ঠিক আছি!' পাল্টা হাঁক ছাড়ল সে। 'জোরে চালান।'

'বিরো কোথায়?'

'আমি এখানে, মিস্টার রানা।'

মাথা টেনে নিতে যাচ্ছে ও, এই সময় ঝড়ের বেগে চত্বরে ঢুকে পড়ল জীপ গাড়িটা। প্রায় একই সাথে ট্রুপ ক্যারিয়ারও। কড়া ব্রেক কষে থেমে পড়ল ওগুলো, ধুলোয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে আঁধার হয়ে গেল জায়গাটা। ভেতর থেকে লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করেছে কোরলা বাহিনী। এদিকে ট্রেন গতি পেতে শুরু করেছে, লেজ বেরিয়ে এসেছে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে। বোঝা যাচ্ছে লাভ নেই, তবু কয়েকজন সৈনিক হাঁটু গেড়ে বসে গুলি চালাতে শুরু করল এলোপাতাড়ি। পিছনের কারে হুলস্থূল পড়ে গেল, শিশু-মহিলা এমনকি পুরুষ যাত্রীরাও প্রাণভয়ে চিৎকার জুড়ে দিল।

সতর্কতার সাথে ওদের গুলির জবাব দিল বুরুজ আলি ও বিরো। সঙ্গে করে আনা ওদের রাশিয়ান এ কে অ্যাসল্ট রাইফেল হুঙ্কার ছাড়তে থাকল মুহুর্মুহু। শেষ মুহূর্তে কোরলার এক চ্যালাকে বুক চেপে ধরে আছড়ে পড়তে দেখল ওরা। ওদিকে যাত্রীদের চিৎকারে ওয়াগনের ছাদ উড়ে যাওয়ার দশা। এরমধ্যে বেশ বেড়ে গেছে রেলগাড়ির গতি, ক্রমে আরও বাড়ছে। গোলাগুলির আওয়াজ পিছিয়ে পড়তে পড়তে থেমে গেল এক সময়। নেরেতভা নদীর বাঁ তীর ধরে দক্ষিণে ছুটে চলল গাড়ি।

'ওয়াও!' কপালের ঘাম মুছে পিছনে তাকাল গগল, মুখে ফ্যাকাসে হাসি। 'কি একখানা এস্কেপ!'

'হ্যাঁ। বড় বাঁচা বেঁচেছি। এখন জেনারেলকে বাঁচানো গেলে হয়।'

মাথা ঝাঁকাল গগল। 'কম করেও দুই পাইন্ট রক্ত গেছে ওঁর। এই বয়সে ধাক্কাটা সামাল দেয়া একটু কঠিনই হবে।'

চুপ করে থাকল রানা। সত্যি তাই। দুটো গুলিই পেটের মধ্যে রয়ে গেছে জেনারেলের, ওগুলো বের করার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা প্রয়োজন। কিন্তু সে সুযোগ দিতে রাজি নয় কোরলা বাহিনী, ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে উঠেছে, ওদের সবাইকে শেষ না মারা পর্যন্ত শান্তি নেই। তাই এতদূর ধাওয়া করে এসেছে।

ওদের বাহন যদি ট্যাঙ্ক না হত, পথের মাঝে যে করেই হোক, নিশ্চয়ই পথরোধ করত সে। সে ক্ষেত্রে কি ঘটত, অনুমান করা কোন কঠিন কাজ নয়। এক ট্রাক বোঝাই সুসজ্জিত সৈনিককে বাধা দেয়া ওদের চারজনের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হত না, অন্তত সামনাসামনি যুদ্ধে।

শেষ পর্যন্ত মাসুদ রানা কোরলাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, সঙ্গীদের সহযোগিতায় হিংস্র হায়েনার খপ্পর থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছে জেনারেল স্টানিস্লাভ ইসমাইলোভিচকে। অর্ধেক বিজয় অর্জন হয়েছে, তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা গেলে আসবে পূর্ণ বিজয়। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জেনারেলকে বসনিয়ার প্রয়োজন আছে, কাজেই তাঁকে মরতে দেয়া চলবে না। কিছুতেই না।

কিন্তু মেটকোভিচে যদি অপারেশনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া না যায়?

ভাবল ও। শহরটা বেশি বড় নয়, তারওপর যেভাবে এ অঞ্চলে খবর রটে গেছে, সার্ব বাহিনী এল বলে, তারপর কি অভিজ্ঞ ডাক্তার-নার্স মেটকোভিচে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়?

'কোন্ ভাবনায় ডুবে গেলে, রানা?' বলে উঠল ভিনসেন্ট গগল। 'ফায়ার বক্স যে খালি হয়ে গেল সে খেয়াল আছে? জলদি কয়লা ভরো, স্টীম প্রেশার হারাচ্ছি আমরা।'

তাড়াতাড়ি বাস্তবে ফিরে এল ও। 'সরি।' কয়লার স্তূপের ফাঁকে প্রায় ডুবে থাকা বেলচা বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। বক্সের দরজা খোলামাত্র উত্তাপের জোর ধাক্কায় নাকমুখের চামড়া ঝলসে যাওয়ার জোগাড় হলো। চোটটা সামলে নিয়ে মেশিনের মত হাত চালাতে লাগল ও, স্টীম গজের লাল কাঁটাটা বেশ নেমে এসেছিল, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল। একটু একটু করে ডায়ালের ডানদিকে সরে যাচ্ছে। গরম আর পরিশ্রমে দুই মিনিটের মধ্যে গোসল হয়ে গেল রানা ঘেমে।

ফায়ার বক্সের গাঢ় সাদাটে কমলা আগুনের আভায় ঘর্মাক্ত রানাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। পিস্টনের মত আগুপিছু করছে ওর পেশী বহুল দু'হাত—ঝপ্ করে কয়লার স্তূপে সেঁধিয়ে যাচ্ছে বেলচা, উঁচু করে ভর্তি কয়লা নিয়ে পিছিয়ে আসছে একটু, তারপর ছুটে যাচ্ছে বক্সের চৌকো চোয়ালের দিকে, ভেতরে পড়ামাত্র উধাও হয়ে যাচ্ছে কয়লা সর্বগ্রাসী আগুনের আড়ালে।

'হয়েছে,' ডায়ালের কাঁটায় চোখ রেখে বলল গগল পাঁচ মিনিট পর। 'এবার থামো, রানা। আপাতত যথেষ্ট হয়েছে।'

বক্সের দরজা বন্ধ করে সোজা হলো ও, বেলচা ফেলে আস্তিনে কপালের-মুখের ঘাম মুছল। প্রশস্ত বুক হাপরের মত ওঠা-নামা করছে। একটু সুস্থির হয়ে ক্যাব থেকে মাথা বের করে বুরুজ আলির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ও। যেন তৈরিই ছিল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে ওয়াগনের দরজায় দেখা গেল তাকে। 'তোমরা সবাই ঠিক আছ?'

'কোন চিন্তা নাই!' জবাব দিল বুরুজ আলি 'ঠিক আছে সব।'

কি যেন ভাবল রানা। 'গগল, আর কতক্ষণ পর কয়লা ভরতে হবে?'

'আধঘণ্টার আগে না। কেন?'

'ভাবছি পিছনে গিয়ে জেনারেলকে একবার দেখে আসি।'

'তা মন্দ হয় না। কিন্তু···পারবে যেতে?'

'আশা করি পারব।'

'দেখো, সাবধান!'

ভাল করে দেখেশুনে এগোল ও। এখানে ওখানে পা রেখে উঠে গেল এঞ্জিনের ছাদে। নিচু হয়ে পিছনের কিনারায় পৌঁছে ওটার আর ওয়াগনের মাঝের ভীতিকর কালো ফাঁকটা দেখল। ঘাড় ঘুরিয়ে হেডলাইটের আলোয় লাইনের ওপর ধারেকাছে কোন ডালপালা আছে কি না দেখে নিশ্চিত হলো ও। নেই। তিন ফুট আন্দাজ ফাঁকটা অনায়াসে পার হয়ে দরজা বরাবর ওয়াগনের ছাদে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।

নিজের নাম শুনে গলা বের করে এঞ্জিনের দিকে তাকাল দানব। 'আমি ছাদে,'

বলল রানা। 'তোমার মাথার ওপর।'

মুখ তুলল সে। চাঁদের আলোয় তার প্রকাণ্ড মুখে মহাবিস্ময়ের ছাপ ফুটতে দেখল রানা। 'আরে সোবাহান আল্লা!' অস্ফুটে বিড় বিড় করে উঠল লোকটা। 'ওহানে আইলেন কেমনে দিয়া! কেমন কইররা!'

বিরো উঁকি দিল এই সময়, তারও চোখ কপালে উঠল রানাকে মাথার ওপর ঝুলতে দেখে। 'গড!'

'তাঁকে পরে ডাকাডাকি কোরো, আগে ধরো আমাকে।'

এক মিনিট পর খোলা দরজায় পা রেখে সোজা হলো মাসুদ রানা। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে কাছেই শুইয়ে রাখা জেনারেলের পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। চেহারা আগের থেকে আরও একটু ফ্যাকাসে হয়েছে যেন বৃদ্ধের, তেমনি ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট, চোখ আধবোজা। মাথা সামান্য ডানে হেলে আছে। ট্রেনের দোলায় একটু একটু ঝাঁকি খাচ্ছে নিঃসাড় দেহ, মাথা দুলছে।

অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বুকের ওঠা-নামা দেখল রানা, একটু ধীর, তবে নিয়মিত বলেই মনে হলো। ঘড়ি দেখল ও, প্রায় চার ঘণ্টা হতে চলল জ্ঞান হারিয়েছেন জেনারেল, এখনও চোখ মেলার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর গালের-কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল ও। ওয়াগনের পিছনদিকে তাকাল।

এখানে ওখানে জড়সড় হয়ে বসে আছে বিশ-পঁচিশজন মেয়ে-পুরুষ, শিশু। পুরুষদের বেশিরভাগই বয়স্ক। মেয়েদের মধ্যে কিছু আছে অল্পবয়সী, কিছু মাঝবয়সী, অনেকের কোলে নেতিয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। সবাই যেন আতঙ্কের মুখোশ পরে আছে ওরা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, অসহায় চেহারা।

প্রাণের ভয়ে জন্মভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে মানুষগুলো। কোথায় যাবে, কি করে খাবে, কিচ্ছু জানে না। স্মৃতির পর্দায় '৭১-এর কথা ভেসে উঠল রানার। হিংস্র পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে তখন এমনিভাবেই বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল হাজার-হাজার, লাখ-লাখ বাঙালি।

কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় বসনিয়া হার্জেগোভিনা— বলতে গেলে কোনদিক থেকেই মিল নেই, তারপরও কত মিল। সেই রাজনৈতিক টানাহ্যাঁচড়া, পরের জমি জবরদখল, সেই অকারণ-নৃশংস গণহত্যা। অসহায়, সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে দেশে দেশে এই জঘন্য রাজনীতির খেলা কবে বন্ধ হবে কে জানে!

একটা শিশুর কেঁদে ওঠার শব্দে ধ্যান ভাঙল ওর। শব্দ লক্ষ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ও। বিশ-বাইশ বছরের এক যুবতীর কোলে কাঁদছে মিষ্টি, ফুটফুটে চেহারার একটি মেয়ে। রানাকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে জড়সড় হয়ে গেল যুবতী, দু'কাঁধের ওপর এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা চাদর দিয়ে নিজেকে ভাল করে ঢেকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। শিশুটির কান্নাও বন্ধ হয়ে গেছে।

'এই মেয়েটিই কাঁদছিল তখন স্টেশনে,' পাশ থেকে বলল বিরো। 'সারাদিনে দু'টুকরো শুকনো রুটি ছাড়া খেতে পায়নি কিছু। খিদে সহ্য করতে পারছে না।'

বুকের মধ্যে বেদনা অনুভব করল রানা। 'আপনার মেয়ে?' যুবতীকে জিজ্ঞেস করল।

জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে, চাদর দিয়ে চোখ ঢাকল। 'ওরই

মেয়ে,' বলল পাশে বসা বয়স্ক এক লোক। 'আমার নাতনী। বাবা নেই ওর। সার্বরা মেরে ফেলেছে। মুক্তিযোদ্ধা ছিল।'

কি বলার আছে? চুপ করে থাকল রানা, তাকিয়ে থাকল ভীত শিশুটির দিকে। এত মিষ্টি চেহারা, দেখলেই কোলে নিয়ে আদর করতে মন চায়।

'রোজ ওকে সার্বদের ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়ায় ওর মা,' আবার বলে উঠল লোকটা। 'ওদের নাম শুনলেই কান্না থেমে যায় ওর। কিন্তু আজ খিদের জ্বালায় সমস্ত ভয়-ডর চলে গেছে, কিছুতেই থামছে না।'

'আপনাদের কারও কাছে খাবার আছে কিছু?' বোধহয় রানার মনের কথা বুঝতে পেরেই জিজ্ঞেস করল বিরো, এক এক করে তাকাল সবার দিকে।

'না,' বলে উঠল এক বৃদ্ধ। 'আমরা সবাই না খেয়ে আছি দু'দিন থেকে। পালিয়ে আসার সময় বাচ্চাদের জন্যে সামান্য যা পেয়েছি নিয়ে এসেছিলাম। শেষ হয়ে গেছে তা।'

মন খারাপ করে ফিরে এল রানা। মানুষের এত দুঃখ-কষ্টের কথা শুনতে ভাল লাগে না। 'সামনে কোথাও থেকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা গেলে হত,' অনেকটা যেন নিজেকে উদ্দেশ করেই বলল ও। 'আমরাও তো সারাদিন না খেয়ে আছি।'

'মানুষজন তো সব পালাচ্ছে, কোথায় পাব খাবার?' বলল বিরো। 'এদিকে মাইলের পর মাইল রুক্ষ পাহাড়ী ভূমি, মাঝেমধ্যে এক আধটা গ্রাম-শহর যা আছে, সব বিরান। আমার মনে হয় সামনে মানুষের ছায়াও নেই। বর্ডারের এত উত্তরের মানুষই যখন পালাচ্ছে, দক্ষিণের মানুষ কি আর বসে আছে?'

কাছে গিয়ে আরেকবার জেনারেলের নাড়ীর গতি পরীক্ষা করল রানা, একই রকম চলছে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, এই সময় চোখের পাতা কেঁপে উঠল বৃদ্ধের। মৃদু গোঙানি বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেল। তাঁর এক হাত মুঠোয় নিয়ে আলতো চাপ দিল রানা, কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকল, 'জেনারেল!'

আস্তে আস্তে চোখ মেললেন তিনি। ঘোলা, অস্থির দৃষ্টি কয়েকবার ঘুরে গেল ওর ওপর দিয়ে, দেখল না।

'জেনারেল!'

আরও কয়েকবার ঘোরাঘুরি করে স্থির হলো বৃদ্ধের চোখ, কিছুটা স্বচ্ছ হয়ে এল নজর। রানাকে কয়েক মুহূর্ত দেখলেন তিনি, তার দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কে? কে তুমি?'

'আমি মাসুদ রানা। এখন কেমন বোধ করছেন আপনি?'

'আমি...আমি কোথায়?'

'ট্রেনে। আপনি সামান্য আহত হয়েছেন, জেনারেল, তাই আপনাকে হসপিটালে নিয়ে চলেছি আমরা।'

'ও।' কিছু সময় নীরব থেকে আবার মুখ খুললেন তিনি। 'সোফিয়া কোথায়? ওরা সব...'

'সবাই আছে, জেনারেল। কিচ্ছু ভাববেন না, আপনাদের ঘাঁটি শত্রুমুক্ত হয়েছে। শিগগিরই আপনার বাহিনী নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করবে আবার। সব সেক্টরে অস্ত্র সরবরাহ করা শুরু হয়ে গেছে। কোন চিন্তা নেই, চুপ করে শুয়ে

থাকুন। সেরে উঠবেন আপনি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'সত্যি?' হাসির আভাস ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'ঘাঁটি মুক্ত হয়ে গেছে? ওরা…ওরা লড়াই…' দুর্বল কণ্ঠ থেমে গেল আপনাআপনি।

'হ্যাঁ,' আরেকবার তাঁর হাতে চাপ দিল ও। 'সত্যি। আর কোন চিন্তা নেই। এবার একটু বিশ্রাম নিন আপনি।'

'আচ্ছা,' বলে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেনারেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন, ঠোঁটে তখনও লেগে আছে হাসির আভাস।

হাতটা আস্তে ছেড়ে দিয়ে উঠল রানা। এখন নিশ্চিন্ত। জানে, খবরের পুরোটা সত্যি না হলেও কথাগুলো ঘুমের মধ্যে জেনারেলের অবচেতন মনের ওপর কাজ করবে, বেঁচে থাকার ইচ্ছে শক্তি বাড়িয়ে তুলবে তাঁর। কাজেই আপাতত এঁকে নিয়ে বিশেষ চিন্তা না করলেও চলবে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। হাতঘড়ি দেখল—আর দশ মিনিট পর কয়লা দিতে হবে ফায়ারবক্সে। ফিরতে হয় এবার।

চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দু'পাশের পাহাড়গুলোকে গাঢ় নীল দেখাচ্ছে। সামনের রেল ট্র্যাককে মনে হচ্ছে যেন চকচকে এক জোড়া রূপালী সুতো। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে চলেছে ওরা উপত্যকা কাঁপিয়ে। দু'দিকের পাহাড়ে বিরামহীন প্রতিধ্বনি তুলছে রেলের সাথে হুইলের সংঘর্ষের ঘটাং ঘটাং শব্দ। কখনও চাপতে চাপতে একেবারে লাইনের কাছে চলে আসছে পাহাড়, আবার কোথাও ক্রমে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সময় এগোচ্ছে আপন নিয়মে। জনহীন ধু-ধু প্রান্তরের মাঝ দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের নিয়ে ছুটে চলেছে মান্ধাতা আমলের ২-৪-২ স্টীম এঞ্জিন। সাপের মত আঁকাবাঁকা লাইনের ওপর ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে, তীক্ষ্ণ বাঁক পেরোবার সময় মনের আনন্দে চিৎকার জুড়ে দিচ্ছে ভারী হুইলগুলো—থেকে থেকে ধোঁয়া আর বাষ্পের হেঁচকি তুলছে লোকোমোটিভ।

তীক্ষ্ণ হুইসেলের আওয়াজে চমক ভাঙল রানার। মুখ বের করে এঞ্জিনের দিকে তাকাল। দ্বিতীয় বয়লার হাম্পের সাথে যুক্ত দীর্ঘ, সরু হুইসল্ পাইপ থেকে তুমুল বেগে বাষ্প বের হচ্ছে। একটু বিরতি দিয়ে আবার বেজে উঠল ওটা। গগল ডাকছে নিশ্চই।

বুরুজ আলি ও বিরোকে কিছু নির্দেশ দিল রানা, তারপর ছাদে উঠে পড়ল ওদের সাহায্যে। এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল এঞ্জিনে। গগল নিজেই বক্সে কয়লা ভরতে লেগে গেছে দেখে তার হাত থেকে বেলচা নিয়ে নিল রানা। 'এত তাড়াতাড়ি? এখনও তো পাঁচ-ছয় মিনিট বাকি আছে তোমার আধঘণ্টা পুরো হতে।'

'তখন কি জানতাম শালা নাকেমুখে কয়লা খায়? এ ব্যাটা আলেকজান্ডারের আমলের না হয়েই যায় না, রানা। এঞ্জিনের কল-কব্জার যা অবস্থা! আমার প্যান্টে যত সেলাইয়ের ফোড় আছে, এ শালা রাক্ষসের গায়ে তারচেয়েও বেশি তালি।'

হাসল রানা। 'এ সবের ব্যাপারে তোমাকে বেশ ভালই অভিজ্ঞ মনে হচ্ছে।

কোথায় শিখলে?'

'এ আর কি!' কাঁধ ঝাঁকাল ইটালিয়ান। 'প্রাণের দায়ে পড়ে কত কিছু শিখেছি জানলে অবাক হবে তুমি।' চুরুট ধরাল সে। 'যাক্‌গে, পিছনের খবর কি?'

'ভাল। জেনারেলের জ্ঞান ফিরেছে।'

'অ্যা!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'তাই নাকি! কখন?'

'এই তো, একটু আগে। তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়েই ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

'অবস্থা কেমন দেখলে ভদ্রলোকের?'

'ভালই।'

লম্বা করে দম ছাড়ল গগল। 'যাক্। ভাল হলেই ভাল। আমি তো আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে কয়লা ভরে থামল রানা, বক্ষ বন্ধ করে ক্যাবের কিনারায় এসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা বাতাসে মন জুড়িয়ে যেতে লাগল। চোখে পড়ল লাইনটা সামনে কিছুদূর এঁকেবেঁকে গিয়ে ঢেউয়ের মত উঠে গেছে ওপরদিকে। ঝুঁকে ভাল করে লক্ষ করল রানা ব্যাপারটা। ব্রিজ নাকি? হ্যাঁ, তাই।

এখান থেকে পুরো বোঝা যায় না, তবে অনুমান করা যায় ওটা ব্রিজই হবে। তার মানে নিশ্চই গভীর খাদ। আরেকটু এগোতে ব্রিজের কাঠের বীম দেখতে পেল রানা। কম করেও একশো গজ উঠেছে ওটা এদিক থেকে, তারপর নেমে গেছে। একটু কাত হয়ে আছে, দূর থেকে অনেকটা আরিচা রোডের নয়ারহাট ব্রিজের মত লাগছে দেখতে।

'কি দেখছ?' জানতে চাইল গগল।

'সামনে দেখো,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও। 'ব্রিজ।'

উঁকি দিল সে। তারপর থ্রটল সামনে ঠেলে দিয়ে গতি খানিকটা কমাল। দু'মিনিটের মধ্যে ব্রিজের আগের বাঁকগুলোর প্রথমটায় পৌঁছে গেল ওরা। ধীরেসুস্থে বাঁক নিল। কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে ঢেউয়ের মাথায় চড়তে শুরু করল লোকোমোটিভ। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ বদলে গেল, নিচের গভীর খাদে চাকা ও রেলের ঠোকাঠুকির ভীতিকর ফাঁকা আওয়াজ উঠছে।

নিকষ কালো খাদের দিকে তাকিয়ে অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। মাত্র তিনটে ওয়াগন নিয়ে ওপরে চড়তে গিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা এঞ্জিনের, ক্রমাগত হেঁচকি আর ঢেকুর তুলছে। অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বয়লার, সবেগে কুচকুচে কালো ধোঁয়া ছুঁড়ছে আকাশে। স্টীম রিলিজের ভয়াবহ আওয়াজে গায়ে কাঁটা দিল ওদের।

এমন সময় আচমকা গুলির আওয়াজ উঠল পিছনে। আহাম্মকের মত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা। আবার গুলি হলো। ক্যাবের মেঝেতে শুয়ে সাবধানে গলা বাড়িয়ে পিছনে তাকাল দু'জনে। সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল। পর পর দুটো বিট্ মিস করল মাসুদ রানার হার্ট। আরেকটা ট্রেন ছুটে আসছে তীরবেগে। একটা ডিজেল এঞ্জিন! তার সামনে জোড়া একটা ফ্ল্যাটকার। খুব দ্রুত মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনছে ওটা।

পরেরবার এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। এঞ্জিন ক্যাবের দেয়ালে বোল্‌তার গুঞ্জন তুলে ছোটাছুটি করে বেড়াল কয়েকটা, তারপর গতি হারিয়ে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়ল।

বাকিগুলো লাগল তিন ওয়াগনে। কাঠ-কাঁচ আর পাতলা স্টীলের আবরণ ছিঁড়েখুঁড়ে শূন্যে উড়িয়ে দিল। পিছন থেকে কান্নাকাটির আওয়াজ ভেসে এল।

সর্বনাশ! আতঙ্কে মুহূর্তখানেক জমে থাকল রানা। সংবিৎ ফিরতে আবার উঁকি দিল। ফ্ল্যাটকারে বেশ কিছু সৈনিককে দেখা গেল, পিলে চমকানো চেহারার এক রিকয়েললেস গান ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকজনের হাতে ছোট অস্ত্রও রয়েছে, চাঁদের আলোয় যতটা বোঝা গেল, মনে হলো সিক্সটিফাইভ-এ লাইট মেশিনগান ওগুলো।

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ বের করেছিল বুরুজ আলি, কড়া এক ধমকে তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল রানা। 'রিকয়েললেসের একটা গোলা যদি হিট্ করে, রানা,' বলল গগল। 'আমরা শেষ। গাড়ি উড়ে যাবে লাইন থেকে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও। চিন্তায় কুঁচকে আছে কপাল।

পিছিয়ে গিয়ে গতি আরেকটু বাড়িয়ে দিল গগল। কিন্তু বিশেষ সুবিধে হলো না, খুব সামান্যই বাড়ল। মুখ কালো করে মাথা দোলাল ইটালিয়ান। 'সরি, বন্ধু। এখানেই বোধহয় একসাথে মরণ লিখেছিল আমাদের নিয়তি।'

কানে গেল না ওর মন্তব্যটা। দ্রুত কিছু একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে। চড়াইয়ের প্রায় মাঝখানে পৌঁছে গেছে ওরা। ওদিকে পিছনের ট্রেনটা প্রথম বাঁক ঘুরতে শুরু করেছে এখন কোনাকুনি, খুব সহজ এক টার্গেটে পরিণত হয়েছে রানাদের ট্রেন। ভাগ্য ভাল যে পিছনের গাড়ির ফ্ল্যাটকারটা দুলছে খুব, তাই চূড়ান্ত আঘাত হানতে দেরি করছে কোরলার বাহিনী। তবে সুযোগটা বেশি সময় স্থায়ী হবে না, যে গতিতে আসছে ওটা, তাতে মাঝের দূরত্ব আর কয়েক মিনিটের মধ্যে কয়েক গজে পৌঁছে যাবে। যতই কাঁপুক, পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা তখন কোন সমস্যাই হবে না। সেটা বুঝতে পেরেই হয়তো অহেতুক গুলি খরচ করছে না ওরা এখন।

গগলের কথাই কি সত্যি হতে চলল? ভাবল ও, এখানেই ওদের মরণ লিখেছে নিয়তি? বাঁচার কোন পথ নেই?

নাকি আছে? ধড়মড় করে উঠে বসল রানা। আছে! অন্তত একটা উপায় আছে। অবশ্য কাজটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ—করতে গিয়ে এমনকি মৃত্যুও হতে পারে ওর। তবু, অন্যরা তো বাঁচবে।

'তুমি একাই কিছুক্ষণ বেলচা চালাও, গগল,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'যত জোরে চালানো সম্ভব চালাও এটাকে।'

সন্দিগ্ধ চোখে ওকে দেখল সে। 'কেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'ওদের ঠেকানোর এখন একটাই পথ আছে, লাইন থেকে উড়িয়ে দেয়া। ওরা আরও কাছে আসার আগেই কাজটা করতে হবে।'

'সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওড়াবে কি দিয়ে? রাইফেল দিয়ে?'

'আমাদের পিছনের প্যাসেঞ্জার কার দুটো খালি, কোনমতে যদি ও দুটো

ছুটিয়ে দেয়া যায়…'

বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল গগল। 'হোলি ক্রাইস্ট! কি বলছ তুমি! তুমি ওপরে উঠলে ওরা চুপ করে বসে থাকবে নাকি?'

'বিকল্প আর কোন উপায় জানা আছে তোমার?'

অবিশ্বাস ভরা চোখে রানাকে দেখল গগল কয়েক মুহূর্ত, চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল কয়েকবার। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল সে, বেলচা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্টীল প্রেশার বাড়ানোর কাজে। একবারও আর এদিকে তাকাল না।

ওদিকে বেশ কিছু সময় বিরতির পর আবার গুলি ছুঁড়তে শুরু করল কোরলা বাহিনী। যদিও একটা গুলিও গাড়িতে লাগল না, মনে হলো ওপরদিকে ছোঁড়া হয়েছে। আবার গুলি হলো, এবারও ঘটল একই কাণ্ড। ব্যাপার কি? ভাবল রানা, ব্যাটারা আকাশে কাকে টার্গেট করছে? ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়ল। এখনও কোনাকুনি উঠছে ওরা, তাই যেদিকে গুলি খাওয়ার ভয় নেই, সেদিক দিয়ে ছাদে উঠে পড়ল ও। পরক্ষণে জমে গেল কয়েক ফুট সামনে প্রকাণ্ড কাঠামোটা দেখে।

বুরুজ আলি!

বুকে হেঁটে প্রায় পৌঁছে গেছে লোকটা প্রথম কোচের শেষ মাথায়। ধক্ করে উঠল রানার বুকের মধ্যে। কখন ছাদে উঠল ও? কোনদিক দিয়ে? পিছনের ওরা কেন এতক্ষণ আকাশে টার্গেট প্র্যাকটিস করছিল, বুঝতে বাকি থাকল না রানার। রেগে উঠল।

'বুরুজ আলি!' কঠিন গলায় হুঙ্কার ছাড়ল। 'ছাদে কেন উঠেছ তুমি! কি করছ?'

থেমে পড়ল দানব। পিছনে তাকাল, গাল ঠেকে আছে কারের ছাদে।

'ওখানে কেন তুমি?' ধমকে উঠল ও। 'ফিরে এসো!'

প্রথম ও দ্বিতীয় কারের মাঝে লোকটাকে উঁকি দিতে দেখে বোঝা গেল পৌঁছে গেছে সে জায়গামত। 'রানা ভাই, পিছনের দুইডারে ছুডাইয়া দেতে আইছি।' চট্ করে পিছনের ট্রেনটাকে দেখল সে। 'সময় নাই। যতি…'

'দাঁড়াও!' দ্রুত এগোল রানা। মনে মনে খুশিই হলো লোকটার তৎপরতা দেখে, তবে চেপে গেল। 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে কেন এলে তুমি!'

'হেইকালে কইতে চাইছেলাম,' অপরাধীর মুখ করে বলল দানব। 'আমনের ধাওয়া খাইয়া…' থেমে গেল সে।

আরেকটু এগিয়ে দুই কারের মাঝে উঁকি দিল রানা। পরস্পরের সাথে বিকট শব্দে ঘষা খাচ্ছে দুই ওয়াগন, দুলছে মাতালের মত। নিচে ঝিক ঝিক করছে মিটার গেজ রেল লাইন। আবার এক পশলা গুলি ছুঁড়ল কোরলা বাহিনী। মাথার ওপর দিয়ে সমানে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক গুলি। কারের গায়ে বিঁধছে ঠক্ ঠক্ করে। ভেতরে কান্নাকাটির রোল, ছোটাছুটি চলছে।

ওদের ট্রেন এখন প্রায় পৌঁছে গেছে ঢেউয়ের মাথায়, পিছনেরটা সবে চড়তে শুরু করেছে।

'কামডা আমারে করতে দেন, রানা ভাই,' অনুনয় করল বুরুজ আলি। 'ওই দুইডারে ছুডাইয়া দেতে পারলে…' আরেক পশলা গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল

তার কণ্ঠ।

চিন্তা-ভাবনার পিছনে বেশি সময় নষ্ট করল না ও। কি বুঝে মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ, যাও।'

অদ্ভুত নিষ্পাপ এক হাসি দিল বুরুজ আলি, পরক্ষণে ঝুলে পড়ল দুই কারের মাঝের ফাঁকে। প্রচণ্ড দুলুনির সাথে দেহের তাল বজায় রেখে খুব সাবধানে দাঁড়াল প্রথম কারের পিছনের বেরিয়ে থাকা সরু প্যাসেজে। তারপর আরও সতর্কতার সাথে পিছনদিক ফিরে বসে পড়ল তার ওপর, দু'পা ঝুলিয়ে দিয়েছে দুই কার জুড়ে রাখা কাপলারের দু'পাশে। ওটার এপাশের অংশে বাঁ হাত রেখে মনে মনে স্বস্তির দম ছাড়ল বুরুজ আলি—এখন আর পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা নেই।

ওপর থেকে তাকে দেখছে রানা। লোকটার নিরাপত্তার কথা ভেবে ধড়াস্ ধড়াস্ করছে বুক। আরও দুই পশলা গুলি হলো ফ্ল্যাট কার থেকে। ছুটে গেল রানার আশপাশ দিয়ে। কয়েকটা বিঁধল পিছনের কারে। এ মুহূর্তে প্রায় সোজা চলছে গাড়ি দুটো, তাই সুবিধে করতে পারছে না কোরলা বাহিনী। জায়গামত লাগাতে পারছে না গুলি।

'হলো তোমার, বুরুজ আলি?'

চোখ তুলল সে। 'পেরায় (প্রায়) হইয়া আইছে। অরা কদ্দুর আউগাইছে, রানা ভাই?'

'অনেক। জলদি করো।'

জোড়াটা খুবই সাধারণ। প্রথম কারের বেরিয়ে থাকা হুকের সাথে আটকে দেয়া হয়েছে পরেরটার দীর্ঘ আংটা। হুকের এক পাশের ফুটো দিয়ে একটা পিন ঢুকিয়ে ওই আংটাকে জায়গামত ধরে রাখার ব্যবস্থা। সেই পিন ধরে টানাটানি করছে বুরুজ আলি। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। গাড়ি ওপরে উঠছে বলে পিছনেরটা টান টান হয়ে আছে হুকের সাথে, সহজে বের হতে চাইছে না পিন, পিছনমুখী প্রচণ্ড টানে সেঁটে আছে ফুটোর সাথে। দানবীয় শক্তিতে টানাহ্যাঁচড়া করে ওটাকে ইঞ্চিখানেক বের করে ফেলল বুরুজ আলি।

'কই, জলদি করো!' তাড়া লাগাল রানা। ভয় হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে রিকয়েললেস গর্জে উঠবে ওদের। গতির কারণে ভীষণ কাঁপছে ফ্ল্যাট কার, নইলে এতক্ষণে শেষ হয়ে যেত ওরা।

আরেক হ্যাঁচকা টানে আরও এক ইঞ্চি বেরিয়ে পড়ল পিন। এবার ওটাকে ভাল করে ধরার সুযোগ হলো বুরুজ আলির।

'কি হলো?' উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল ও, আর বড়জোর দুই মিনিট পরই ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে পড়বে ওদের ট্রেন। 'খুলছে না?'

'পিন "—" মারানীর পো খোলতে আছেলে না, রানা ভাই।' মাঝের কয়েকটা শব্দ নিচু কণ্ঠে উচ্চারণ করল সে, শুনল না ও।

'খুলেছে?'

'হ, লরছে (নড়েছে)। দিমু টান?'

'এক মিনিট,' মাথা তুলে পিছনে তাকাল রানা। চড়াইয়ের মাঝপথে পৌঁছে গেছে পিছনেরটা, ব্যবধান বেশ দ্রুত কমছে। আরেকটু উঠলে খুব ভাল হয়।

আরেক ঝাঁক বুলেট বর্ষণ করল কোরলা বাহিনী। 'করতে থাক্, হালারফালারা (শালার পো শালা)!' চাপা গলায় বলল বুরুজ আলি। 'শ্যাষ কর ব্যাবাক (সব)। এট্টু পর তোরাও থাকবি না, ওয়াও কোনো কামে আইবে না।' মুখ তুলল সে। 'রানা ভাই? দিমু টান?'

'এক সেকেন্ড! হ্যাঁ, রেডি হও। ওয়ান···টু···'

'থ্রিরি!' বিকট এক হুঙ্কার ছেড়ে পিনটা সর্বশক্তিতে টান মারল বুরুজ আলি, জোর 'টং' শব্দে বেরিয়ে এল ওটা।

প্রায় একই মুহূর্তে গতি অর্ধেক কমে গেল পিছনের দুই ওয়াগনের, এঞ্জিন আর অবশিষ্ট কার পৌঁছে গেছে চূড়ায়, সামনে কিছুটা সমতল পথ, তারপর দীর্ঘ উৎরাই। দেখতে দেখতে থেমে গেল বাঁধনমুক্ত দুই প্যাসেঞ্জার কার, দু'তিন সেকেন্ড ইতস্তত করে ধীর গতিতে রওনা হয়ে গেল পিছনের দিকে।

হাত বাড়িয়ে বুরুজ আলিকে উঠে আসতে সাহায্য করল রানা। উঠে ওর পাশে শুয়ে হাঁপাতে লাগল সে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই রকেটের গতি লাভ করেছে কার দুটো, হুড়মুড় করে নামছে। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকল ওরা।

অনেকগুলো কণ্ঠের আতঙ্কিত চিৎকার ভেসে এল ফ্ল্যাটকার থেকে, বুঝে ফেলেছে তারা কি ঘটতে যাচ্ছে। কিছু জোয়ান অস্ত্র ফেলে সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ছোটাছুটি শুরু করে দিল ক্যারময়, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কেঁদেও উঠল কে যেন। শেষ চেষ্টা হিসেবে ডিজেল এঞ্জিনের এয়ার ব্রেক চেপে ওটাকে থামানোর জন্যে মরীয়া হয়ে উঠল ড্রাইভার। কানে তালা লাগানো কিচ্ কিচ্ টানা আওয়াজ করে উঠল হুইল, ঘোরা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু গতি তবু ঠেলে নিয়ে আসছে ওটাকে। প্রতিটা চাকা থেকে ফুলকি ছুটছে ভীষণভাবে।

একই সঙ্গে রিভার্সও করেছিল বুঝি ড্রাইভার—চড়াই, কড়া ব্রেক ও রিভার্স গিয়ার, তিন শক্তি মিলে অল্প সময়ের মধ্যে দাঁড়ও করিয়ে ফেলেছিল প্রায় ওটাকে। আর কয়েক সেকেন্ড সময় পেলে বেঁচেই যেত, উল্টোদিকে ছোটার সুযোগ পেলে।

কিন্তু হলো না।

হেলেদুলে, তুফান বেগে ছুটে গিয়ে সামনের ফ্ল্যাটকারের ওপর প্রচণ্ড শক্তিতে আছড়ে পড়ল জোড়া ওয়াগন, সংঘর্ষের ভয়াবহ শব্দে গোটা উপত্যকা কেঁপে উঠল। কানে তালা লেগে গেল ওদের সবার। কাঠ, ইস্পাত ও মানুষের হাড় মাংস লাফিয়ে আকাশে উঠে গেল, এবং পরমুহূর্তে চোখ ধাঁধানো গাঢ় কমলা রঙের বড়সড় এক আগুনের কুণ্ড ব্যাঙের ছাতার মত বিস্তার লাভ করল ওখানটায়। তার আভায় পরিষ্কার দেখা গেল, ব্রিজের বড়সড় একটা অংশও উড়ে গেছে বেমালুম।

দুটো গাড়ির বাকি যা ছিল, মশালের মত জ্বলতে জ্বলতে রওনা হয়ে গেল নিচের গভীর খাদের উদ্দেশে, স্লো মোশন ছায়াছবির মত।

ধড়মড় করে উঠে বসল রানা ও বুরুজ আলি, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে মশালগুলোর দিকে। গাড়ি ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে বুঝতে পেরে শক্ত হয়ে বসল ওরা।

'বুরুজ আলি!'

'জ্বে?'

'কাজটার জন্যে তোমার ধন্যবাদ পাওয়া উচিত। কিন্তু যেভাবে করেছ, ঠিক করোনি। ভবিষ্যতে এরকম জরুরী অবস্থায় আর কখনও আমার নির্দেশ ছাড়া এক পা-ও ফেলবে না, তুমি। বুঝতে পেরেছ?'

'আচ্ছা,' একান্ত অনুগতের মত মাথা দোলাল দানব।

দশ

আধ ঘণ্টা পর, এঞ্জিন ক্যাবের মেঝেতে পাশাপাশি বসে আছে মাসুদ রানা ও ভিনসেন্ট গগল। ধোঁয়া গিলছে নীরবে। এইমাত্র আরেকবার জেনারেলকে দেখে ফিরেছে রানা। যার যার চিন্তায় ডুবে আছে। এক সময় শিউরে উঠল ইটালিয়ান। 'সিনেমায় এমন ঘটনা অনেক দেখেছি, রানা, কিন্তু বাস্তবে!' আরেকবার কেঁপে উঠল সে। 'গড! এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওটা বাস্তবে ঘটেছিল।'

রানা চুপ করে থাকল। আনমনা।

'তোমার বুরুজ আলি সাঙ্ঘাতিক এক চীজ,' হেসে উঠল গগল। রানাকে দেখল প্রশংসার দৃষ্টিতে। 'জুড়ি মানিয়েছে ভাল তোমাদের, যেমন দুঃসাহসী ওস্তাদ, তেমনি তার শিষ্য।'

'কিছু খাবার জোগাড় করা গেলে ভাল হত,' আধ খাওয়া সিগারেটটা টোকা মেরে বাইরে ফেলে দিয়ে বলল রানা।

'ঠিক বলেছ। উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছিলাম সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি আজ। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট।'

'বাচ্চাগুলোর কষ্ট অনেক বেশি হচ্ছে আমাদের চেয়ে। গলা বসে গেছে ওদের কাঁদতে কাঁদতে। পুরো দু'দিন হতে চলল ছোটার ওপর আছে পরিবারগুলো। খাবার নেই, পানি নেই। বাচ্চাদের কান্নাকাটি সহ্য করা যায় না।'

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল গগল। বাইরে তাকাল। 'ঠিক বলেছ। কিন্তু…কোথায় পাই এখানে খাবার?'

'মেটকোভিচ আর কতদূর?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে আশা করি।' উঠল গগল। 'খানিকটা স্টীম আপ করে দেখি আরও আগে যাওয়া যায় নাকি।'

থ্রটল আরেকটু টেনে দিল সে। রানা উঠে বক্সে কয়লা ভরতে শুরু করল। একটু একটু করে গতি বাড়তে থাকল ট্রেনের, তার সাথে সমান তালে বেড়ে চলেছে কাঁপুনি। চাঁদ আরও হেলে পড়েছে, নীল আকাশে ঝলমল করছে ওটা। ভোর হতে দেরি নেই বেশি।

'জেনারেলকে কেমন দেখলে এবার, রানা?'

'একইরকম, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস একটু নিয়মিত মনে হয়েছে।'

'আমার ভয় হচ্ছে মেটকোভিচে তাঁর অপারেশন সম্ভব হবে কি না।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'আমারও। ওখানে কোরলা বাহিনী আবার

আক্রমণ করে কি না, সে আশঙ্কাও উড়িয়ে দিতে পারছি না।'

'অত দক্ষিণে তেমন কিছু করার মত ক্ষমতা ওদের আছে বলে মনে হয় না,' বলল গগল চিন্তিত মনে।

'ধারণার ওপর ভরসা করতে সাহস পাচ্ছি না, গগল। এ পর্যন্ত কোরলা যা দেখাল, ভেবে দেখো, কোন অংশে কম নয় তা। ভেবেছিলাম লোকটার যত বাহাদুরি বুঝি অ্যাপথসেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু তা তো নয়। অ্যাপথস থেকে ইস্তান পর্যন্ত খোলা রাস্তায় আমাদের তাড়া করে এসেছে সে, ওখান থেকে ট্রেনে করে তেড়ে এসেছে কত পথ। কেউ এগিয়ে এল না আমাদের সাহায্য করতে। এত পথ পেরিয়ে এলাম, কোথাও সরকারী বাহিনীর ছায়া পর্যন্ত দেখলাম না। কাজেই সুযোগটা সে যদি আবার নিতে চায়, কে ঠেকাবে তাকে? আফটার অল, জেনারেল এখন তার একমাত্র ভরসা।'

'কিন্তু ব্যাপারটা ঘটেছে রাতের আঁধারে, রানা, সেটাও তোমাকে মনে রাখতে হবে। তারওপর আমরা এসেছি বলতে গেলে বেপথে। কোরলার বাহিনী আমাদের অনুসরণ করেছে সরকারী যানে। ব্যাপারটা যদি দিনের বেলাও ঘটত, তবু হয়তো সাহায্য করতে এগিয়ে আসত না কেউ। সবাই ধরে নিত, ট্যাঙ্ক নিয়ে কোথাও যুদ্ধ করতে কি আর কোন কাজে যাচ্ছে সরকারী বাহিনী, অথবা আর কিছু।'

'সে আমিও ভেবেছি। সেই জন্যেই তো মেটকোভিচ নিয়ে আরও বেশি দুশ্চিন্তায় আছি, গগল। ওখানে যদি কিছু করতে চায় কোরলা, সেটাকেও হয়তো একই ব্যাপার ধরে নেবে সবাই। বাধা দিতে আসবে'না। আর আমরা যদি কারও সাহায্য চাই, সেটাও বিশ্বাসযোগ্য হবে না, কারণ আমরা বিদেশী। কেউ বিশ্বাস করবে না আমাদের।'

সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল ও। আচমকা নতুন এক আইডিয়া এসেছে মাথায়, ওটাকে ঘষা-মাজা করতে লেগে পড়েছে।

অনেকক্ষণ বাইরে তকিয়ে থাকল গগল। 'রানা,' ঘুরল সে। 'মেটকোভিচে সরকারী বাহিনীর ঘাঁটি তো আছে, সরাসরি সেখানে চলে যেতে পারি না আমরা?'

'অনেক বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। তাছাড়া নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ওরা, আমাদের সাহায্যে করতে পারবে কি না, তাই বা বুঝব কি করে?'

আবার কিছু ভাবল রানা। 'আমার মনে হয় ঘাটি পর্যন্ত পৌছতেই দেবে না আমাদের কোরলা। তার আগেই চূড়ান্ত আঘাত হানবে। বারবার ব্যর্থ হয়ে ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে গেছে ও।'

'দিলে তো আবার টেনশনে ফেলে?' দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে শুরু করল গগল। 'তাহলে? তোমার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে শহরের কাছেই যাওয়া উচিত হবে না আমাদের।'

'ঠিক, আমিও যেতে চাই না।'

'তাহলে? কোথায় যাব আমরা?'

'মিলিটারি এয়ার বেসে।'

বিস্ময় ফুটল ইটালিয়ানের চেহারায়। 'মানে?'

'তার আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ওদের একটা প্লেন হাইজ্যাক করে পেসকারা নিয়ে যাব আমি, তখন তোমার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। পারবে ব্যাপারটা সামাল দিতে?'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল ভিনসেন্ট গগল। ঝাড়া এক মিনিট অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। আনমনে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, 'গড হেলপ আস্! প্লেন হাইজ্যাক?'

'শুধু লুকিয়ে ফেলতে হবে ওটা তোমাকে, ব্যস্,' বলল রানা।

'একটা কেন, রানা, দশটা হাইজ্যাক করে নিয়ে চলো তুমি, শুধু পেসকারার সেই এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে দাও, তারপর আমি বুঝব কি করতে হবে না হবে।'

'ওটার রানওয়ে কত ফিট লম্বা?'

'চার হাজার ফুট।'

'একটু শর্ট, তবে ম্যানেজ করা যাবে আশা করি।'

'তাহলে বাকি আর সব আমি ম্যানেজ করব,' হাসল গগল। 'সের দরে বেচে দেব প্লেন লোহা লক্কড়ের দোকানে। কিন্তু··· এতবড় ঝুঁকি নেয়া কি ঠিক হবে?'

'জেনারেল ইসমাইলোভিচের মৃত্যুর আশঙ্কা না থাকলে নিতাম না। তাঁর জন্যেই কাজটা করতে হবে। ইটালির দূরত্ব কম, অল্প সময়ে পৌঁছে যেতে পারব আমরা। ওখানে নিশ্চিন্তমনে গোপনে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারব। বসনীয় বাহিনীর মনোবল বহাল রাখার জন্যে তাঁর বেঁচে থাকা জরুরী। তাছাড়া সোফিয়াকে আমি কথা দিয়ে এসেছি···'

'বুঝেছি। মেটকোভিচ এয়ার বেসটা কোথায়?'

হিপ পকেট থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বের করল রানা, মেলে ধরল মেঝেতে। 'এখানে,' শহরের সামান্য উত্তরে টোকা মারল ও। রেল লাইনের খুব কাছেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল গগল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল, রানাও মুখ তুলল ঝট্ করে। আওয়াজটা দু'জনেরই কানে গেছে। হেলিকপ্টারের আওয়াজ। একটু একটু করে এদিকেই আসছে যেন। ছুটে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল ওরা, এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজতে থাকল জিনিসটাকে, দেখা গেল না। শব্দ কোনদিক থেকে আসছে ট্রেনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজের জ্বালায় বোঝাও যায় না।

গভীর গিরিখাতের মধ্যে দিয়ে ছুটছে ট্রেন, দু'দিকে আকাশ-ছোঁয়া ক্লিফের সারি। হেলে পড়া চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় গাছ-ঝোপঝাড় সব কেমন অদ্ভুত লাগছে দেখতে, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে গা ছমছম করে। ক্রমে নিচেরদিকে নামছে ওরা, ক্যাবের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলছে বাতাস। বেশ শীত করছে।

একটু পর গিরিখাত ছেড়ে বেরিয়ে এল ট্রেন, দু'পাশে খোলা-মেলা মাঠের মধ্যে দিয়ে এগোল। যতদূর দেখা যায় সবুজ আর সবুজ গমের খেত। এসে পড়েছে নেরেতভা উপত্যকা, তারপর ক্যাপলিনা ছাড়িয়ে মেটকোভিচ।

অনেকক্ষণ পর কপ্টারটাকে দেখতে পেল রানা। বেশ ওপর দিয়ে মেটকোভিচের দিকে উড়ে চলেছে। ওটা কাদের হতে পারে ভেবে পেল না ও।

'কি মনে হয়,' বলে উঠল গগল। 'কোরলার ইনফর্মার?'

'আমার তাই মনে হয়।' হঠাৎ কি খেয়াল হতে মনে মনে হাসল রানা।

সামনের গাছপালার মাথায় আলো দেখা দিয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে আছে। ওটা ক্যাপলিনা। একটুপর দেখতে পেল আবার ফিরে আসছে কপ্টার। কাছে এল না, মাঝে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে ঝুলে থাকল বেশ উঁচুতে।

'স্পীড কমাও, গগল,' বলল রানা। 'আগেই নেমে পড়ি।'

থ্রটল সামনে ঠেলে দিল সে। 'এখনই?'

উত্তর দিল না রানা। দেখে মনে হয় অস্থির হয়ে উঠেছে ভেতরে ভেতরে। গলা বাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে চোখ কুঁচকে। মাইল দেড়েক সামনে থেকে ধীরে ধীরে ওপরদিকে উঠে গেছে রূপালী সুতোজোড়া, অনেক উঁচু মেটকোভিচের দিকে। এক ঝাঁক পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দে চমকে উঠল রানা। চকচকে এক লেকের বুক থেকে একযোগে আকাশে উঠে পড়েছে হাজার হাজার পাখি। ট্রেনের শব্দে ভয় পেয়েছে।

মনে পড়ল রানার, মেটকোভিচ বহিরাগত পাখিদের ইউরোপের সবচেয়ে বড় চারণভূমি। শীতকালে বিশেষ করে সাইবেরিয়ার সমস্ত লেক জমে গেলে লাখ লাখ পাখি এখানে চলে আসে। ওদের মধ্যে বেশিরভাগই নানান জাতের হাঁস। বসন্ত সবে শুরু, ওদিকের বরফ গলতে দেরি আছে এখনও, তাই চরে বেড়াচ্ছে ওরা এখানে।

'রানা! এখানেই নামতে চাইছ?'

আঙুল তুলে আকাশ দেখাল ও। 'ফড়িংটা আবার ফিরে এসেছে, ঘুরঘুর করছে। সুবিধের মনে হচ্ছে না অবস্থা। আগে নেমে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এতদূর এসে কোনরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।'

'তাহলে আর দেরি কিসের?' সামনে তাকাল গগল। 'ওই তো এসে পড়েছে মেটকোভিচ। দাঁড় করাব গাড়ি?'

'আমরা নামলেও গাড়ি দাঁড়াবে না,' আনমনে বলল ও।

'মানে?'

রহস্যময় হাসি ফুটল রানার মুখে। 'পরে বলছি, আগে আরও একটু কমাও স্পীড, আমাকে নামতে হবে।'

প্রশ্ন করার জন্যে মুখ খুলেও কি ভেবে থেমে গেল ইটালিয়ান, থ্রটল খানিকটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'দেখো, ওটা হয়তো আমাদের ওপরই নজর রাখছে।'

'হয়তো,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবু এটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে, উপায় নেই। তুমি এই গতিতে চলতে থাকো, আমি পিছন থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরব।'

পাঁচ মিনিট না, তিন মিনিট পরই ফিরে এল ও, ধীরগতির এঞ্জিনের পাশে দৌড়াতে লাগল। 'গগল, এক মিনিটের জন্যে থামাও গাড়ি, জেন্যারেলকে নামাতে হবে। নজর রাখো, কাজ হয়ে গেলেই রিভার্স করে নেমে পড়বে তুমি।'

'রিভার্স!' বিস্মিত হলো ইটালিয়ান। 'কেন?'

'যা বলছি তাই করো!' মৃদু ধমক লাগাল ও। 'মিডিয়াম স্পীডে ছেড়ে দিয়ে নেমে এসো। পরে শুনো কেন।'

'অল রাইট, মেজর,' থ্রটল সামনে ঠেলে দিল গগল। বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে

থেমে পড়ল গাড়ি।

এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই গাড়ি চালু করে লাফিয়ে নেমে পড়ল ভিনসেন্ট গগল। রানার সাথে এসে যোগ দিল। দুই কোমরে হাত রেখে আকাশ দেখছে রানা, কপ্টারকে অনুসরণ করছে ওর দৃষ্টি। পথের মাঝে ওদের উল্টো দৌড় শুরু করতে দেখে ওটার কিছু প্রতিক্রিয়া হয় কি না দেখতে চায়। যদি হয়, ওটার উপস্থিতির কারণ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে। যদিও প্রায় নিশ্চিত হয়েই আছে মাসুদ রানা।

মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে অভ্রান্ত প্রমাণ হলো ওর অনুমান। গোঁত্তা খেয়ে বেশ নিচে নেমে এল কপ্টার, কয়েক মুহূর্ত লেগে থাকল ট্রেনের সাথে, তারপর পড়িমরি ছুটল মেটকোভিচের দিকে। ওরা প্রত্যেকে লক্ষ করল ব্যাপারটা।

মুখ ফিরিয়ে স্ট্রেচারে শোয়া জেনারেলকে দেখল রানা। স্ট্রেচার তৈরির বুদ্ধিটা বুরুজ আলির। গাড়ির মাল রাখার নড়বড়ে বাঙ্কের সাপোর্টার, দুটো রড, আর সীটের পুরু কাপড়ের তিনটে কভার ছিঁড়ে ওটা বানিয়েছে সে। সেলাই করে জুড়তে হয়েছে কাপড়, তাতেও কোন সমস্যা হয়নি। মেয়ে যাত্রীদের কয়েকজনের পোঁটলাতেই মজুত ছিল সুঁই-সুতো। তিনটে কভার এক করে তার দীর্ঘ দুই প্রান্ত মুড়ে ভেতরে রড ভরে দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়েছে বুরুজ আলি। ধরার সুবিধের জন্যে দু'দিকেই খানিকটা করে বেরিয়ে আছে রড। পায়ের গোড়ালি খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে জেনারেলের, তাতে অবশ্য কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

কেমন এক ঘোরের মধ্যে রয়েছেন বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ পর পর চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক, আবার ঘুমিয়ে পড়ছেন এক সময়।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে নারী-পুরুষের দলটা, মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। 'এরা কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল গগল।

'ঘর ছেড়েছিল ম্যাসেডোনিয়া হয়ে গ্রীস যাবে বলে,' বলল বিরো। 'কিন্তু আমি ওদের দেশ ছাড়তে নিষেধ করেছি। ভেতরের ঘটনা জানতে পেরে এরাও মত পাল্টেছে, যাবে না। আপাতত দুয়েকদিন এখানেই কোথাও কাটিয়ে ফিরে যাবে।'

ওদের কথা শুনছে না মাসুদ রানা। ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে। এরমধ্যে দেড়-দু'শো গজ পিছিয়ে গেছে ওটা, পিস্টনের চাপে সাদা বাষ্প বের হচ্ছে সিলিন্ডার থেকে, দুটো বয়লার হাম্পই কালো ধোঁয়া ছাড়ছে। কতদূর যেতে পারবে ওটা? ভাবল রানা, ফাঁকিটা ধরতে কত সময় লাগবে ওদের? এরমধ্যে কি আসল কাজ সেরে ফেলতে পারবে ওরা?

গগলও কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর ফিরল রানার দিকে। 'তুমি ভাবছ ওরা তাড়া করবে ওটাকে?'

'হ্যাঁ। এবং সেই জন্যেই রিভার্স দিতে বলেছিলাম। তাড়া যদি সত্যি করে, ওটা যে খালি ট্রেন, বুঝতে ওদের কিছু সময় লাগবে। আমাদের কাজে লাগবে সময়টা।' বুরুজ আলির দিকে ফিরল রানা। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

মাথা ঝাঁকাল দৈত্য। স্ট্রেচারের দুই মাথা ধরে তুলল সে আর বিরো। জেনারেলের দু'চোখ বোজা, একটু একটু কাঁপছে চোখের পাতা।

'গগল, চলো, এগোতে শুরু করি আমরা। এয়ার বেসের সিকিউরিটি ব্যবস্থা চেক করতে হবে।'

আগে আগে চলল ওদের চারজনের দল। বুরুজ আলি ও বিরো একটু পিছনে। জটলাটাও চলেছে সাথে। চাঁদ ডুবতে দেরি নেই। আর বড়জোর এক ঘণ্টার মধ্যে ভোরের আলো ফুটবে। নীরবে, যথাসম্ভব দ্রুত হাঁটতে থাকল ওরা। চারদিক একদম শান্ত, সমাহিত। ভুট্টার গাছ বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে সর সর করে।

জোর কদমে পনেরো মিনিটের মধ্যে ক্যাপলিনা উপশহর পৌঁছে গেল ওরা। এখান থেকে মেটকোভিচ আধ ঘণ্টার পথ। এরমধ্যে অনেকটা পিছিয়ে গেছে ওদের ট্রেন। গড়ানোর আওয়াজ প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে। এমন সময় আঁতকে উঠল রানা সামনের দিকে তাকিয়ে।

পরিষ্কার দেখা যায় না, তবে মনে হলো আরেকটা ট্রেন, যেন পা টিপে টিপে নেমে আসছে ওপর থেকে। তিন-চারটে প্যাসেঞ্জারস কার রয়েছে ওটার সাথে—মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত কোথাও একটা আলোও জ্বলছে না। কালো এক সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে নামছে। ধাওয়া করবে এখনই পরিত্যক্ত ট্রেনটাকে।

'তোমার অনুমানই সত্যি হলো তাহলে!' ফ্যাকাসে হাসি দেখা দিল গগলের মুখে। 'কিন্তু এ কাজ তো ওরা আগেও করতে পারত।'

'তা পারত,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো ভেবেছে এই পথেই তো আসছি আমরা, শুধু শুধু ছুটে গিয়ে লাভ কি?'

এগারো

মেটকোভিচের আলো আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে এখন। এখান থেকে তিন-চার কিলোমিটারের বেশি হবে না বোধহয় দূরত্ব। ঠাণ্ডা বাতাস নাকেমুখে আরামের পরশ বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমে আচ্ছন্ন দুটো রিসোর্ট ও জেলে পল্লী, ওপুযেন আর পোলসি অতিক্রম করল ওরা। অ্যাড্রিয়াটিক তীরের এই দুই পল্লী ছোট, পরিচ্ছন্ন। পিছনে রূপালী চাদরের মত চিক্ চিক্ করছে ডালমাটিয়ান কোস্ট। লোকসংখ্যা কম, দুই পল্লী মিলিয়ে বড়জোর শ'দুই-তিন হবে।

ঘরদোরের চেহারা দেখে বোঝা যায় মানুষ আছে এখানে। এরা মোটামুটি সচ্ছল জেলে, একটা-দুটো মাছ ধরার ট্রলার সব পরিবারেরই আছে। তাই এখনও রয়ে গেছে এরা, হয়তো পরিস্থিতি কোনদিকে গড়ায় বোঝার জন্যে। বেগতিক দেখলে ট্রলারে চড়ে যে-কোন মুহূর্তে সরে পড়ার সুযোগ এদের আছে, তাই পালায়নি এখনও। প্রয়োজন পড়লে অলবেনিয়া, গ্রীস বা ইটালি, যেদিক খুশি যেতে পারবে।

মেটকোভিচ মোটামুটি বড় শহর—রেলওয়ের বড়সড় এক জংশন ও ব্যবসা কেন্দ্র।

ওপুযেন, পোলসি ও মেটকোভিচ, তিনটেই এ অঞ্চলের একমাত্র মিষ্টি পানির উৎস নেরেতভা নদীর তীরে, তাই প্রকৃতিও এখানে শ্যামল-সবুজ। শহরের প্রান্তে পৌঁছে থেমে পড়ল রানা। মিনিট পাঁচেক জিরিয়ে না নিলে হচ্ছে না। জেনারেল ইসমাইলোভিচের স্ট্রেচার ওরা চারজন পালা করে বয়ে এনেছে। রানা আর গগলের পালা চলছে এখন।

ওটা মাটিতে রেখে সোজা হলো রানা, সামনে তাকাল। দলে এখন ওরা পাঁচজন আছে। ওপুযেন পৌঁছার আগেই আলাদা হয়ে গেছে বসনিয়ানদের দলটা। রানা ও বুরুজ আলি যে মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে সবার প্রাণ বাঁচিয়েছে, যাওয়ার আগে সে জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেনি অশিক্ষিত, গেঁয়ো মানুষগুলো। জনে জনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে তারা সবার প্রতি। সেই শিশুটি তখন মায়ের কোলে ঘুমে বিভোর।

বিশাল এক পাইন বনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা—সামনে নদী, পিছনে অ্যাড্রিয়াটিক। বারোটা মুখ এখানে নদীর, বারোটা সরু চ্যানেল এখান-ওখান দিয়ে শহরের বুক চিরে সাগরে গিয়ে মিশেছে। রক্ষণশীল শহর মেটকোভিচ, শতকরা নব্বইজনই মুসলমান এখানে। বেশ কয়েকটা মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে। গির্জাও চোখে পড়ল একটা।

যেমন তার নাম, তেমন চেহারা। কাপেলা ব্লাযেনোগ ইভানা উরিনিয়া বা চ্যাপেল অভ দ্য ব্লেসড আইভান উরজিনি ওটার নাম, চেহারা ষাট-সত্তর বছর আগে নির্মিত ড্রাকুলা জাতীয় ছবিতে যে সব গির্জা দেখানো হত, তেমনি। দেখলেই কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি জাগে চামড়ার নিচে।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর আবার রওনা হলো ওরা। পাঁচ পা যাওয়ার আগেই ভেসে এল আযানের সুর।

'এখনই বের হবে মুসল্লিরা,' চাপা কণ্ঠে বলে উঠল রিয়ো। 'আমাদের ব্যাক স্ট্রীট দিয়ে যাওয়া উচিত।'

মাথা দোলাল রানা। 'পথ দেখাও।'

গির্জার পিছনে নিয়ে এল সে ওদের, জংলা ঝোপঝাড়ে ভর্তি প্রাচীন এক কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে এগোল। ঝোপগুলো মেডিটারেনিয়ান শ্রাব বা স্থানীয় ভাষায় 'মাক্কিয়া' নামে পরিচিত। এছাড়া আছে রোজমেরি ঝোপ—বিশেষ করে রাতে বাতাসে সুগন্ধ ছড়ায় এ ঝোপ। জলপাই, ডুমুর গাছও প্রচুর দেখা গেল এখানে, সবই অযত্নে বেড়ে ওঠা। মাক্কিয়া ঝোপ বেশ উঁচু হয়, প্রায় এক মানুষ সমান।

দূর দিয়ে মূল শহর কেন্দ্রের গ্রাদাসকা ভিলেসনিকা বা টাউন হল অতিক্রম করল ওরা। মেটকোভিচের অন্যতম প্রধান দর্শনীয় ভবন ওটা ট্যুরিস্টদের। খুবই সুন্দর প্রায় গোল এক ভবন। এটার নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল রোমান ও গথিক যুগের মধ্যবর্তী রোমানেসক স্থাপত্য শিল্পীরা, কাজ শেষ করতে পারেনি তারা। পরের কাজ এগোয় গথিক স্টাইলে। এরপর কিছু এগিয়েছে ইউরোপীয় স্টাইলে। শেষ কাজটুকু অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান।

দুই ব্লক এগোতে বিশাল এক মসজিদ দেখা গেল। এ-ও আরেক দর্শনীয় জায়গা। ১৫৬৬ সালে এটা নির্মাণ করেন সুলতান সোলায়মান দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট।

একজন দু'জন করে নামাজীরা আসছে, জুতো বাইরে রেখে নিশ্চিন্তমনে ভেতরে ঢুকে পড়ছে। এই দৃশ্য বাংলাদেশের বেলায় কল্পনা করা কঠিন, ভাবল রানা। ওখানে আগে পাদুকা সামলাতে হয়, তারপর নামাজ। নইলে খালি পায়ে বাসায় ফেরা ছাড়া উপায় থাকে না। এই ভয়ে কত মানুষ যে মসজিদে যায় না, দেশে ফেরার সুযোগ হলে এবার তা নিয়ে একটা জরিপ চালিয়ে দেখবে নাকি রানা? মুচকে হাসল ও।

একজন-দু'জন মেয়ে মুসল্লীও দেখতে পেল ওরা, বোরখায় দেহ-মুখ ঢেকে মসজিদে চলেছে। চোখ দুটো বেরিয়ে আছে কেবল। নির্ভয়ে, স্বচ্ছন্দে পথ চলছে তারা। ছিনতাইকারী বা দুশ্চরিত্র লম্পটদের ভয় নেই।

দশ মিনিট এক নাগাড়ে হেঁটে এয়ারবেসের মেইন গেটের খানিকটা তফাতে অন্ধকার মত জায়গা দেখে দাঁড়াল ওরা। বুরুজ আলি ও বিরোকে দ্রুত বুঝিয়ে দিল রানা কি কি করতে হবে। তারপর স্ট্রেচারসহ ওদের ওখানেই রেখে সামনে এগোল গগলকে সঙ্গে নিয়ে।

গেটের এক-দেড়শো গজ দূরের বড় এক পাইন গাছের আড়ালে দাঁড়াল ওরা অবস্থা বোঝার জন্যে। শহর থেকে আসা চমৎকার গ্র্যাভেল মোড়া চওড়া রাস্তা ওদের দশ গজ সামনে দিয়ে চলে গেছে বেসের দিকে। পুরো বেস সাইক্লোন ফেন্স দিয়ে ঘেরা। গেটের এক পাশে একটা সেন্ট্রি বক্স দেখল রানা, অন্যদিকে আকারে একটু বড় এক গার্ড হাট। দুটোতেই একজন করে গার্ড বসা। ভেতরে হেলান দিয়ে বসে আছে লোক দুটো। ঘুমে ঢুলছে। হাতের অটো রাইফেল পড়ে আছে কোলের ওপর।

গেটের ওপর নজর বোলাল ওরা। বড় বড় ফাঁকওয়ালা স্টীলের জাল দিয়ে তৈরি ওটা। তালা মারা।

ট্রেনটা কতদূর পৌঁছল কে জানে, ভাবল রানা। ধরা পড়ে গেছে এতক্ষণে? ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে ওরা?

আকাশে দিনের আভাস দেখা দিতে খুব একটা দেরি নেই, এরই মধ্যে নীড় ছেড়েছে কিছু পাখি, নানান আওয়াজ তুলে এদিক-ওদিক উড়ে চলেছে তারা। ভিনদেশী পাখিরাও ডানা মেলেছে কোথাও কোথাও। তবে আশ্রয় থেকে সরছে না, উঠে খানিক ওড়াউড়ি করে নেমে পড়ছে। তাদের কলকাকলীতে মুখর হয়ে আছে মেটকোভিচ।

শহরের বাইরের এক টার্কিশ স্টাইলের প্রাসাদোপম ভিলা। সামনের বিশাল পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে একটা কালো রঙের বিলাসবহুল ক্যাডিলাক, আর তিনটে হুড টপ রাশিয়ান স্কোডা জীপ। পরেরগুলো বসনীয় সামরিক বাহিনীর ছাপ মারা। এলাকাটা জনবিরল, তারওপর বাড়ির সামনের বাগান-গাছপালার জন্যে ওগুলোকে দেখা যায় না রাস্তা থেকে।

ভেতরে বড় এক রুমে আট-দশজন মানুষ, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। তাদের দু'জন সিভিল ড্রেসের, অন্যরা ইউনিফর্মড। বসনিয়ান আর্মি টিউনিক। এক মেজর, দুই ক্যাপ্টেন এবং অন্যরা লেফটেন্যান্ট। সিভিল ড্রেস পরা দু'জনের একজন কর্নেল

কারমানোভিচ কোরলা, অন্যজন সার্বিয়া সরকারের প্রতিনিধি, নাম পোলগার মিলান। নৌ বাহিনীর কমান্ডার।

রূমের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করছে কোরলা, ভীষণ অস্থির। রাগে আর দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে। সার্ব কর্নেল সোফায় বসা, মাথা হেঁট হয়ে আছে তার। গম্ভীর। আর সবাই দাঁড়িয়ে, দু'তিন জায়গায় জটলা করছে। কথা বলছে নিচু কণ্ঠে। থেকে থেকে উদ্বিগ্ন চোখে কোরলাকে দেখছে।

প্রচণ্ড রাগে অস্থির হয়ে আছে কোরলা, কারণ এইমাত্র ওয়্যারলেসে খবর এসেছে, তাদের পাঠানো ট্রেন পাকড়াও করেছে পরিত্যক্ত ট্রেনটাকে। এবং ওটায় কেউ নেই। কখন, কোথায় নেমে গেছে যাত্রীরা, জানা যায়নি।

এক সময় মুখ তুলল সার্ব প্রতিনিধি, সরাসরি কারমানোভিচ কোরলার দিকে তাকিয়ে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'তাহলে বেলগ্রেডকে কি জানাব আমি, কর্নেল? শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন আপনি, এই তো?'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল কর্নেল, রাগে দু'চোখ ঠিক্‌রে পড়বে যেন। 'নট্ ইয়েট, কমান্ডার! কর্নেল কোরলা এত সহজে হার মানতে শেখেনি।'

'উইথ অল রেসপেক্ট, কর্নেল, অ্যাপথস কি হাতছাড়া হয়নি আপনার?'

'হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ঠেকানোর চেষ্টায় আমি যে কোন ত্রুটি রাখিনি, সেটাও নিশ্চই জানেন আপনি?'

'জানি। কিন্তু আমার জানায় বিশেষ কিছু আসে-যায় না। ঘাঁটিসহ জেনারেল ও তার জামাইকে সামাল দেয়ার পূর্ণ দায়িত্ব আপনারই ছিল, অথচ দুটোতেই ব্যর্থ হয়েছেন আপনি। ব্যাপারটাকে বেলগ্রেড ভাল চোখে দেখছে না। কারণ এর মধ্যে প্রচুর টাকা ঢালা হয়েছে আপনার পিছনে, প্র-চু-র টাকা। আপনার সুইস ব্যাঙ্কের নাম্বারড্ অ্যাকাউন্ট অলমোস্ট রেডি, শুধু বেলগ্রেড গ্রীন সিগন্যাল দিলেই চালু হয়ে যাবে। আর যে সব চুক্তি ছিল, তারও সমস্ত কিছুই রেডি। যে মুহূর্তে মিশন শেষ হবে, সেই মুহূর্ত থেকে সব আপনার হয়ে যাবে। অথচ...'

'কমান্ডার, এ ব্যাপারে বেলগ্রেড কি করেছে, না করেছে সবই জানা আমার। কিন্তু এই ব্যর্থতার সব দায় আমার ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করবেন না, ঢিলেমি আপনাদেরও আছে। তাছাড়া আমার ওয়্যারলেসের ফ্রিকোয়েন্সি আপনার সেটের বদলে যদি বেলগ্রেডের সাথে সেট করা থাকত, ওরা হামলা করার সাথে সাথে এয়ার সাপোর্ট চাইতে পারতাম আমি। কিন্তু...আরও তিনদিন আগে অ্যাপথসের ভার বুঝে নেয়ার কথা ছিল আপনাদের, নেননি। এখন-তখন করে সময় নষ্ট করেছেন। নৌ-কম্যান্ডো নিয়ে সময়মত আপনারই আসার কথা ছিল, অথচ আসেননি। করকুলায় একটামাত্র শিপ নিয়ে বসে বসে সময় নষ্ট করেছেন। এ জন্যে কে দায়ী?'

'আমি দায়ী, আই মীন আমরা দায়ী, স্বীকার করি। কিন্তু আমরা সময়মত আসিনি, তা তো নয়। এসেছিলাম, কাজে নামার জন্যে তৈরি হয়েই। কিন্তু কে জানত কোথাকার কোন্ এক হারামজাদা স্পাই এতবড় চাল চালবে, ভুয়া খবর দিয়ে ঠিক সময়মত আমাদের শিপগুলোকে ব্যস্ত করে তুলবে?'

'দেখুন তাহলে, শুধু আমাকেই নয়, আপনাদেরও লোকটা ঘোল খাইয়ে

ছেড়েছে। অথচ সে আপনাদের পরিচিত। বেলগ্রেডই তাকে অতীতে সোজা কথায় স্পাই নেটওয়ার্ক চালানোর লাইসেন্স দিয়েছিল। আপনাদের জানা ছিল যে সে একজন স্পাই, ব্রিগেডিয়ার কিয়েরযেকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অথচ নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করতে রাজি নয় মনে হচ্ছে বেলগ্রেড।

'সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় স্পাইটাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে আমাদের, ব্যাপারটা আপনারা বুঝেও না বোঝার ভান করছেন। অ্যাপথসে যা হওয়ার হয়েছে, তারপর ওদের তাড়া করতে গিয়ে দলবলসহ মরেছে মেজর ইভান কারাক। আমার ডান হাত। ট্রেনটার ওপর নজর রাখার জন্যে আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম, সেটাও ঠিকমত করতে ব্যর্থ হয়েছেন আপনারা। পথের মাঝে থেমে দাঁড়াল ওটা, আহত জেনারেলকে নিয়ে এতগুলো মানুষ নেমে গেল, কিচ্ছু টের পেল না আপনাদের পাইলট। আপনারা...' থেমে গেল কোরলা। রাগে কথা আটকে গেছে।

সামলে নিয়ে আবার তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল। 'কোথায় নেমেছে ওরা, সে জায়গাটাও স্পষ্ট করতে পারেনি হারামজাদা, এমনই গুণের পাইলট, ছুটে এসেছে ট্রেনের ফিরে যাওয়ার খবর জানাতে! আর সব দোষ হলো বুঝি আমার?'

'আমি বুঝতে পেরেছি আপনার সমস্যা, কর্নেল,' নিজেদের ব্যর্থতার পাল্লাই বেশি ভারী বুঝতে পেরে মিনমিনে গলায় শুরু করেছিল কমান্ডার, কিন্তু থামিয়ে দিল কোরলা।

'কিছুই বুঝতে পারেননি! আমার গায়ে সীল পড়ে গেছে, দিনের আলোয় মানুষের চোখে পড়ে গেলে কি ঘটবে আমার ভাগ্যে, অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। তারপরও ঝুঁকি নিয়ে এতদূর ছুটে এসেছি আমি। শুধুমাত্র আপনাদের ব্যর্থতাই এজন্যে দায়ী। এখন যদি জেনারেলকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে মাসুদ রানা, আমার শেষ ভরসাটাও যাবে।' অস্থির হাতে সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকল কোরলা।

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। অন্যমনস্ক চেহারায় দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে পোলগার মিলান। উপস্থিত অন্যরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আড়ষ্ট সবাই। বেশ কিছু সময় নীরবে কেটে গেল।

'আমার মনে হয় এসব তর্ক বাদ রেখে আসল ব্যাপারে মন দেয়া উচিত আমাদের,' খানিক উসখুস করে বলল কমান্ডার। 'লোকগুলো কোথায় গেল, খুঁজে দেখা উচিত। নিশ্চই মেটকোভিচের কাছেই কোথাও নেমে পড়েছে ওরা।'

'মানলাম,' জোরে সিগারেটে এক চুমুক দিয়ে বলল কোরলা। 'কিন্তু কোথায়, কত আগে নেমেছে? কেন?'

জটলার ভেতর থেকে এক ক্যাপ্টেন সাহস করে বলে উঠল, 'ওপুযেন বা পোলসির কাছাকাছি কোথাও নেমে গিয়ে থাকতে পারে ওরা, স্যার। সাগর ওখান থেকে একদম কাছে, জেলেদের বোটও আছে অনেক, হয়তো...তার একটা নিয়ে আর কোন দেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

এতক্ষণ জমে বসে ক্যাপ্টেনের কথা শুনছিল কমান্ডার মিলান, এইবার প্রবল এক ঝাঁকি খেল। ছাগলের বাচ্চার মত তিড়িং করে এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

'বোট! তাহলে তো এক্ষুণি যেতে হয় আমাকে। আমার স্পীডবোট অপেক্ষা করছে নীচে, যদি তাড়া করে ধরতে পারি...' কোরলাকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল।

'তেমন হলে এতক্ষণে নিশ্চই আপনার শিপের রাডারে ধরা পড়ত বোট, ওরা খবর জানাত আপনাকে।'

'হ্যাঁ, তাই তো!' বোকা বোকা চেহারা হলো পোলগার মিলানের। 'তাহলে আর কোথায় যেতে পারে?'

'কোথাও হয়তো গা ঢাকা দিয়েছে,' বলল সেই ক্যাপ্টেন।

'অসম্ভব!' এবার আগের চেয়ে জোরে মাথা নাড়ল কোরলা। 'জেনারেল ইসমাইলোভিচের অবস্থা খারাপ, আমি জানি। জরুরী চিকিৎসা প্রয়োজন তাঁর, মেজর অপারেশন প্রয়োজন।'

'তাহলে এই শহরেরই কোন ডাক্তারের আশ্রয়ে আছে হয়তো ওরা,' পরামর্শ দেয়ার সুরে বলল কমান্ডার। 'এখানেই চিকিৎসার কাজ চলছে তার গোপনে।'

চোখ কুঁচকে মেজর লোকটার দিকে তাকাল কোরলা। 'তেমন ভাল কোন সার্জন আছে এখনও এখানে? আমার তো মনে হয় না।'

'আমারও মনে হয় না, স্যার,' বলল মেজর। 'জেলে শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর সবাই অনেক আগেই পালিয়ে গেছে। তবু যদি বলেন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখি একবার। আলো ফুটতে এখনও কিছু বাকি, এই সুযোগে একটা চক্কর মেরে আসি।'

'তাই করো। যাও সবাই, কুইক!'

একযোগে দরজার দিকে পা বাড়াল সবাই, শুধু অল্পবয়সী এক লেফটেন্যান্ট নড়ল না। একেবারে বাচ্চা সে, সবে গোঁফের রেখা জেগেছে। ভয়ে ভয়ে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে আছে সে, মনে হলো কিছু বলতে চায়।

'তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কি মনে করে?' খেঁকিয়ে উঠল কোরলা। 'যাচ্ছ না কেন?'

কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েই থাকল সে, ওদিকে দরজার কাছে পৌঁছে থেমে পড়ল অন্যরা, ঘুরে তাকাল। 'আমার একটা ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে, কর্নেল, স্যার!' তার মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালে দৃষ্টি রেখে হড়বড় করে বলে উঠল সে। একটু একটু কাঁপছে।

'কিসের সন্দেহ?'

'ওরা...ওরা হয়তো এয়ারবেসের দিকে গেছে।'

ভিড়িম করে বোমা পড়ল ঘরের মধ্যে।

'এয়ারবেস!' মাথার মধ্যে চক্কর খেয়ে উঠল কোরলার, গলা ভেঙে গেল। অন্যরা পাথর। চোখ বিস্ফারিত। 'এয়ারবেসে কেন যাবে?' চেঁচিয়ে উঠল কর্নেল।

'মনে হয় প্লেন নিয়ে...'

'প্লেন? প্লেন নিয়ে যাবে কি করে? ওদের মধ্যে কোন পাইলট নেই।' লেফটেন্যান্টকে নয়, অনেকটা যেন নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যেই কথাটা বলল সে। যদিও ভেতরে কাঁপ উঠে গেছে আতঙ্কে।

'স্যার,' কর্নেলের দিকে তাকাতে সাহসে কুলোচ্ছে না, তাই চোখ বুজে বলল সে আবার। 'থ্রিলারে পড়েছি স্পাইরা প্লেনও চালাতে পারে। জেমস বন্ড পারে।

এই লোকটাও তো স্পাই, হয়তো এ-ও পারে।'

আবার শব্দহীন বোমা পড়ল ঘরে। শব্দ না থাক, তার অদৃশ্য শক্ ওয়েভের ধাক্কায় অন্তরাত্মা উড়ে গেল সবার। হতভম্ব মেজরের দিকে ঘুরল কোরুলা ঝট্ করে। 'এয়ারবেস!' গলা ভেঙে গেল। 'এয়ারবেসে ছোটো সবাই। হারি আপ্! হারি আপ্!! হারি আপ্!!!'

*

বেসটা একেবারে সাগরের তীরে।

গেটের পঞ্চাশ-ষাট গজ ওপাশে ছোট এক দোতলা ভবন— কন্ট্রোল টাওয়ার। ছাদে কয়েকটা অ্যান্টেনা, তারপাশে ছোট তবে শক্তিশালী এক রাডার অনবরত ঘুরছে। আলো জ্বলছে অবজার্ভেশন রূমে, নিশ্চই লোক আছে।

টাওয়ারের ওপাশে ছোট দুটো হ্যাঙ্গার। তার মুখোমুখি, খুদে এয়ারফিল্ডের ওপাশে নিচু ছাদওয়ালা দুটো বিল্ডিং। সম্ভবত এয়ারমেন'স ব্যারাক। ব্যারাকের কোন রূমে আলো নেই, তবে সামনের বারান্দায় আছে। দুটো করে আলো জ্বলছে। দুটো রানওয়ে দেখতে পেল মাসুদ রানা, অনুমান আট হাজার ফুট দীর্ঘ হবে একেকটা। X-এর মত পরস্পরকে ছেদ করেছে ।

হ্যাঙ্গারের দিকে নজর দিল ও। উঁচু সিলিঙে একটা কি বড়জোর দুটো করে আলো জ্বলছে, তাতে কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। নাইটগ্লাস থাকলে ভাল হত, ভাবল রানা, কিন্তু নেই। তাড়াহুড়োয় ফেলে এসেছে। দূর থেকে খালি চোখে ভেতরের প্লেনগুলো সনাক্ত করতে কিছু সময় লাগল। প্রথম হ্যাঙ্গারের ও মাথায় একটা বড় রাশান ইলিউশন-১৪ ট্রান্সপোর্ট প্লেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার এপাশে গোটা তিন-চার আরটি-৩৩। ওগুলোর পিছনে আরও কয়েকটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অন্ধকারে একটাকেও চেনা গেল না।

ইলিউশন বা আরটি দিয়ে কাজ হবে না, জানে রানা। কারণ ওগুলোর ব্যাপারে ও একেবারেই অজ্ঞ। কাজেই পিছনেরগুলোই এখন একমাত্র ভরসা। ওগুলো কি বিমান জানতে হবে ওকে, এবং সে জন্যে হ্যাঙ্গারের কাছে পৌঁছতে হবে। দুই ঘুমন্ত গার্ডের ব্যবস্থা করতে হবে তার আগে।

গগলের সাথে ইশারায় কথা বলল রানা, তারপর পা টিপে টিপে গেটের দিকে এগোল দু'জনে। গগল হাটের দিকে, ও বক্সের দিকে। সবে যে যার জায়গায় পৌঁছেছে, এমন সময় আচমকা আলো হয়ে উঠল পিছনে। চমকে উঠল ওরা, পিছনে এক পলক তাকিয়েই বাঁদরের মত লাফ দিয়ে আড়ালে চলে গেল। বক্স আর হাটের পিছনে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল দু'জনে, হাতে অস্ত্র প্রস্তুত। ঢিব্ ঢিব্ করছে বুকের মধ্যে। ওদিকে বুরুজ আলি ও বিরো হায় হায় করছে। স্ট্রেচার আরও কয়েক ফুট পিছনে সরিয়ে দু'জনে দুই গাছের আড়ালে দাঁড়াল ওরা ঝটপট। এ কে অ্যাসল্ট রাইফেলের স্টক কাঁধে ঠেকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে।

ঝড়ের বেগে পৌঁছে গেল গাড়ি, একটা নয়, তিনটে। বসনীয় পতাকা আঁকা তিন স্কোডা। প্রথমটা থেকে লাফিয়ে নামল সেই মেজর, হাতে এম ফিফটি সেভেন সাইডআর্ম। অটোম্যাটিক। রাশান টোকারেভ-এম ১৯৩৩ অটোম্যাটিকের ইয়োগোস্লাভ যমজ ভাই। পিছনের জীপ থেকে নামল আরও দু'জন, দুই ক্যাপ্টেন।

এদের হাতেও এক জিনিস। দ্রুত মেজরের পাশে চলে এল তারা। প্রথমে তালা মারা গেটটা দেখল, তারপর গার্ডদের দিকে তাকাল। এতগুলো গাড়ির শব্দেও ঘুম ভাঙেনি ব্যাটাদের।

'সব তো ঠিকই আছে মনে হয়,' নিচু গলায় বলল এক ক্যাপ্টেন। 'গেটে তালা মারা...'

'ওরা এলে সদর দরজা দিয়েই ঢুকবে, এমন কথা কে বলল তোমাকে?' কপাল কুঁচকে বলল মেজর। মহাবিরক্তির ছাপ ফুটল চেহারায়। 'পাছায় লাথি মেরে তোলো ও দুটোকে। গেট খুলে গাড়ি নিয়ে ভেতরে যাব আমি, পেরিমিটার ফেন্স কেটে ঢুকেছে কি না ওরা দেখতে হবে। তুমি হ্যাঙ্গার, অবজার্ভেশন টাওয়ার চেক করো।'

'জ্বি। কিন্তু, স্যার, ওরা যদি টের পায়?' ব্যারাক ইঙ্গিত করল ক্যাপ্টেন। 'যদি বাধা দেয়?'

'কেন দেবে? ওরা কি অন্ধ, আমরা যে ওদের আর্মি টিউনিক পরে আছি, তাকালে দেখতে পাবে না?'

'না, বলছিলাম, যদি কিছু সন্দেহ করে বসে!'

'বসে বসুক না,' হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল মেজর। 'বাধা দেয়ার সুযোগ পেলে তো! যাও যাও!'

গালে শক্ত হাতের চড় খেয়ে লাফিয়ে উঠল বক্সের গার্ড। তার ঠিক এক ফুট পিছনে বক্সের বাইরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা নিঃশ্বাস বন্ধ করে। ততক্ষণে বুটের দুই লাথিতে ঘুম পালিয়েছে গার্ডের, চোখের সামনে এতজন অফিসার দেখে তোতলাতে শুরু করল সে। কাঁপছে।

'গেটের চাবি!' চোখ লাল করে ছোটখাট হুঙ্কার ছাড়ল মেজর। 'জলদি বের কর।'

'জ্বি, জ্বি!' পকেট থেকে চাবির গোছা বের করল লোকটা কাঁপা হাতে। 'কিন্তু, স্যার, আপনারা?'

'চোপ্, শালা!' দাবড়ি লাগাল প্রথম ক্যাপ্টেন। 'ডিউটির সময় পড়ে পড়ে ঘুমানো বের করছি তোমাদের, দাঁড়াও,' চাবি ছিনিয়ে নিয়ে বলল সে। ঘুরে দ্বিতীয় গার্ডকে দেখল, সে তখনও বিভোর।

'কেউ এসেছিল এখানে?' জানতে চাইল মেজর। 'চার-পাঁচজনের একটা দল?'

'না, স্যার!'

'কি করে নিশ্চিত হলে? তুমি তো ছিলে ঘুমিয়ে।

'না, মানে...'

দ্বিতীয় ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে চোখ টিপল মেজর। 'এদের ঘুম পার্মানেন্ট করে দাও।'

গার্ড ব্যাপারটা টের পেল অনেক দেরিতে। যখন পেল, কিছুই করার ছিল না। ঠিক মাঝকপালে গুলি খেল লোকটা। দু'পা পিছিয়ে ধপ্ করে বক্সের ভেতর বসে পড়ল। চিৎ হয়ে পড়ে গেল। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ব্যবহার করেছে ক্যাপ্টেন,

ওপারে হাটে ঘুমন্ত গার্ড টেরই পেল না। তাকে ঘুমের মধ্যেই হত্যা করল ক্যাপ্টেন, দু'জনের অস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে জীপের সামনের ফুট বোর্ডে রাখল।

ত্রিশ সেকেন্ড পর দুটো গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল মেজর। দুই ক্যাপ্টেন ও দুই লেফটেন্যান্ট সঙ্গে থাকল তার। বাকিরা অবশিষ্ট জীপ নিয়ে গেট পাহারায় থাকল। সেই ছোকরা লেফটেন্যান্টও আছে তাদের মধ্যে। বিনা বাধায় মিনিট দশেক ধরে বেস চক্কর দিল মেজর। হ্যাঙ্গার চেক করল, তারপর ফিরে এল সন্তুষ্টমনে। পুব আকাশ ফিকে হতে শুরু করেছে।

'কই হে!' ভুরু নাচাল মেজর সেই লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরে। 'পেলাম না তো তোমার স্পাইকে। আসেইনি। এর চেয়ে আমাদের আগে শহরে যাওয়াই উচিত ছিল বোধহয়। ভবিষ্যতে আর কখনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময় জেমস বন্ডকে টানাটানি কোরো না, বুঝলে? সব স্পাই জেমস বন্ড নয়।'

'ইয়েস, স্যার,' অ্যাটেনশন হয়ে বলল তরুণ।

'তোমরা তিনজন থাকো এখানে, আমরা শহর থেকে একটা চক্কর মেরে আসি। বেশি আলো হয়ে গেলে...' পরের কথাগুলো বোঝা গেল না, ভোঁ করে ছুটে গেল স্কোডা জীপ। বাঁক ঘুরে গাড়ি দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতেই বক্সের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল রানা। তিন অল্পবয়সী যুবককে দেখতে পেল, তিনজনই লেফটেন্যান্ট। এপাশেরটা একেবারে ছেলেমানুষ। একজন বসে আছে জীপের বনেটে, অন্য দু'জন সামনের বাম্পারে—সিগারেট ফুঁকছে। তাকিয়ে আছে বেসের দিকে।

পিছন থেকে মৃদু খুক্ কাশির শব্দে ঘুরে তাকাল শেষের ছেলেটি। পাশাপাশি অস্ত্র হাতে রানা ও গগলকে দেখে এমন ভীষণভাবে চমকে উঠল সে যে হাত থেকে সিগারেট পড়েই গেল। কিছু একটা যে ঘটেছে, অন্য দু'জনও তা টের পেল। পিছনে তাকাল তারা, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল।

'ঘাবড়িয়ো না,' অমায়িক কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'আমার নির্দেশ শুনলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। আমরা তোমাদের মত অকারণ খুন-খারাবি করি না।' ওয়ালথার নাচিয়ে মৃত দুই গার্ডকে দেখাল ও। 'বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল থ্রিলার ভক্ত। 'আমাদের নিয়ে কি করবেন?'

'কিছু না। শুধু হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যাব।'

পাথরমুখো গগলকে দেখল ওরা একনজর, তারপর আবার রানার দিকে তাকাল। পরেরজনকেই বেশি ভয়ঙ্কর মনে হলো ওদের। 'আ-আপনারা কারা?' জানতে চাইল লেফটেন্যান্ট। অন্য দু'জনের জবান বন্ধ হয়ে গেছে আতঙ্কে।

'জানোই তো,' এগিয়ে এল রানা। 'তবু কেন জিজ্ঞেস করছ?'

ঢোক গিলল সে। অপলক চোখে ওর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ করছে। 'না, মানে...আপনিই সেই স্পাই?'

'নামো!' কঠিন গলায় হুকুম দিল ও। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো সবাই রাস্তায়। নাপৃরেদ!'

ঝটপট শুয়ে পড়ল তিনজনই। ওদের ঘাড়ে পিস্তল ধরে বুরুজ আলির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল রানা। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল লোকটা, কয়েক মুহূর্ত পর স্ট্রেচার নিয়ে

খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সে আর বিরো। 'আমরা জেনারেলকে নিয়ে হ্যাঙ্গারে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'তোমরা এদের বেঁধে রেখে এসো।'

'জ্বে!'

'জেনারেল' শুনে তিন লেফটেন্যান্টই চমকে গেল ভেতরে ভেতরে। মুখ তুলে তাঁকে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু সুযোগ হলো না। ততক্ষণে স্ট্রেচার নিয়ে রওনা হয়ে গেছে রানা ও গগল।

'হাক্ কইররা (হাঁ করে) চাইয়া রইছ্ দেহি?' কনিষ্ঠটির উদ্দেশে চোখ গরম করে চাপা হুঙ্কার ছাড়ল বুরুজ আলি। 'থাবর মাইররা দাতের পাড়ি খুইল্লা হালামু। হুইয়া থাক্!' তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে কুঁকড়ে গেল ওরা। বিরো ওদেরই জীপের পিছন থেকে খানিকটা দড়ি খুঁজে নিয়ে এল, ওটাকে তিন খণ্ড করে কষে বাঁধল সবাইকে। বাঁধন টেনেটুনে পরীক্ষা করল বুরুজ আলি, সোজা হলো। দুই কোমরে হাত রেখে তিন লেফটেন্যান্টকে দেখল।

'হুইয়া থাক্! বেইল (বেলা) ওডলে তোগো বাবারা আইবে, হেকালে (তখন) বুজবিহ্যানে মজা। গুরাগারার (শিশু) দল! নাক টেপলে দুদ বাইরাইবে এহনও, অ্যার মইদ্যেই বেঈমানীতে পাস কইররা হালাইছ? মোসলমান হইয়া মোসলমানের লগে গাদ্দারী!' থোক্ করে এক দলা থুতু ফেলল সে।

'হালারফালারা! মরলেও ভিক্ষ্যা কইররা খাওয়া লাগবে তোগো!'

ওদের হত্যা করা হবে না, বুঝে ফেলেছে ততক্ষণে থ্রিলার ভক্ত, তাই নির্ভয়ে, দুই চোখে কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখছে সে পলকহীন। 'উনিই সেই স্পাই?' বলল সে। 'মাসুদ রানা?' কেউ উত্তর দিল না দেখে আবার জানতে চাইল, 'উনি প্লেন চালাতে জানেন?'

'কি কয় নউয়ার পো (শ্বশুরের ছেলে)?' বিরোকে জিজ্ঞেস করল দানব। ওর ভাষা না বুঝলেও প্রশ্নটা ঠিকই বুঝল সে, ব্যাখ্যা করল। শুনে লেফটেন্যান্টকে দেখল সে। 'চোউক (চোখ) মেইল্লা চাইয়া থাক্! সমায় অইলে দেকপিহ্যানে, বেঈমানের বাচ্চা!'

আরেক দফা থুতু ফেলল বুরুজ আলি। ঘুরে দাঁড়াল।

পিছন থেকে ওদের যতক্ষণ দেখা গেল, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লেফটেন্যান্ট। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে শুধু রানাকেই দেখছে সে।

বারো

হ্যাঙ্গারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আকাশযানগুলোর ওপর নজর বোলাতে লাগল রানা ব্যগ্র চোখে। পরিচিত মডেলের একটা প্লেন খুঁজছে, কিন্তু চোখে পড়ছে না।

বর্তমান যুগে অচল, একেবারে মান্ধাতা আমলের তিনটে জ্যাসটার্ব বসে আছে এক সারিতে। দ্বিতীয়বার ওগুলোর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করল না। একদিকে কয়েকটা আরটি-৩৩, একটা বৃহদাকার সি-৪৭, দুটো ইলিউশন-১৪ এবং কয়েকটা

অ্যালিউটি-১১১ কপ্টার।

শিট্!

হতাশ হয়ে উঠল মন। কি হবে এখন? কপ্টার ছাড়া উপযুক্ত কিছু চোখে পড়ছে না। তারওপর ওগুলো বেশ ছোট এবং ধীরগতির। ওতে চলবে না। স্ট্রেচার নামিয়ে রাখল ওরা। মৃদু গুঙিয়ে উঠলেন জেনারেল। জ্ঞান ফিরছে। আবছা আলোয় ভীতিকর সাদা লাগছে চেহারা। ঠোঁট একটু একটু নড়ছে।

'থাক এখানে,' গগলকে বলল রানা। 'আমি অ্যাপ্রনের পিছনদিকটা দেখে আসি।'

'তাড়াতাড়ি!'

অ্যালিউটিগুলোকে পাশ কাটিয়ে আট-দশ পা এগোল ও। অ্যাপ্রনের পিছনদিক অন্ধকার। ওখানে আবছা একটা কাঠামো— চেনা চেনা লাগছে যেন। গতি পড়ে এসেছিল, খেয়াল হতে দ্রুত পা চালাল। একটু একটু করে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে কাঠামোটা। দুটো বিট্ মিস্ করল হার্ট, দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দ্রুতগামী ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। চিনতে পেরেছে ও কাঠামোটাকে।

ইলিউশন-২! দুই এঞ্জিনের প্লেন। অ্যালুমিনিয়াম ফিউজিলাজ চক্ চক্ করছে ওটার।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'গগল! ওদের তাড়াতাড়ি আসতে বলো।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইটালিয়ান, শব্দ চাপা দেয়ার জন্যে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ছুট লাগাল। যদিও কয়েক পা গিয়েই থেমে পড়তে হলো তাকে। পৌঁছে গেছে বুরুজ আলি ও বিরো। বুরুজ আলিকে গেটে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল রানা, বাইরে নজর রাখতে বলল। বাকি দু'জনকে স্ট্রেচার নিয়ে ওকে অনুসরণ করতে বলে পা বাড়াল ইলিউশনের দিকে।

জায়গামত পৌঁছে বোঝা নামিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল গগল। 'উপযুক্ত জিনিস পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'বোধহয়।'

প্লেনটাকে দেখল ইটালিয়ান আগ্রহ নিয়ে। 'কি এটা?'

'ডিসি-থ্রীর রাশিয়ান কপি,' হাসল রানা। 'রাসকি ডাকোটা। আগেও কয়েকবার চালিয়েছি।'

'গুড!' উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। 'চলো তাহলে কেটে পড়ি।'

'দাঁড়াও।' হঠাৎ করেই সন্দেহ জাগল রানার। কেন যেন ওর মনে হলো প্লেনটা বাইরে দেখতে যেমনই হোক, ভেতরে আসল জিনিসপত্র নেই। বাতিল। নইলে অ্যাপ্রনের একেবারে শেষ মাথায় নিঃসঙ্গ কেন পড়ে থাকবে?

নিশ্চই ওটার এঞ্জিন নেই, অথবা ফুয়েল ট্যাঙ্ক খালি। নয়তো ব্যাটারি ডেড। রাশিয়া কম করেও চল্লিশ বছর আগে তৈরি করেছে ইলিউশন-২, আজকাল এগুলো দেখাই যায় না। ঘুরে ঘুরে প্লেনটা দেখল ও সন্দেহের চোখে। আকাশে ওড়ার উপযুক্ত এটা? নাকি...

'কি হলো, রানা?' অধৈর্য হয়ে উঠল গগল। 'দেরি কিসের?'

'ভাবছি এটা উড়বে কি না,' আনমনে বলল ও। সন্দেহের কারণ সংক্ষেপে

ব্যাখ্যা করল।

'এই সেরেছে!' মুখ কালো হয়ে গেল তার। 'এখন উপায়?'

'চলো, ভেতরে উঠে দেখা যাক কি অবস্থা,' ভরসা দিল রানা, যদিও বলার সুরে উল্টোটাই ফুটল বেশি। দরজা খুলে ফেলল।

ওর পিছন পিছন গগলও উঠল। ভেতরে এক পলক নজর বুলিয়ে দোরগোড়াতেই থমকে দাঁড়াল সে। 'দূর!'

ককপিটের দিকে এগোতে গিয়ে থেমে পড়ল ও। 'কি?'

'এটা চলে কি করে? একটা সীটও নেই!'

'মনে হয় কার্গো প্লেন হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাই খুলে রাখা হয়েছে। দাঁড়াও, আমি আসছি।'

পা বাড়াল রানা। ইলিউশন-২ সম্পর্কে অতীতের জ্ঞান ঝালাই করতে লাগল মনে মনে। ডাকোটারই একটু উন্নত সংস্করণ এটা। ৯৫ ফুট উইংস্প্যান, ৬৪ ফুট দীর্ঘ, ওজন ২৫ হাজার পাউন্ড, ১৮ শো হর্সপাওয়ারের একজোড়া এঞ্জিন, সার্ভিস সিলিং ১৬ হাজার ফুট এবং গতি ১৪০ নট।

যদি ওড়েও, ভাবল রানা, যা চেহারা তাতে গতি অর্ধেকও উঠবে কি না ঘোর সন্দেহ। 'গগল, নিচে যাও। টায়ারে হাওয়া আছে কি না দেখে এসো গিয়ে।'

ফ্লোরে হাইড্রলিক ব্রেক অয়েলের শুকনো দাগ দেখতে পেল ও, তার মানে লীক আছে লাইনের কোথাও। ককপিটে ঢোকার মুখে বাঁ দিকের দেয়ালে ঝোলানো মেডিসিন চেস্টের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

'আছে, রানা!' ইটালিয়ানের উদ্দীপ্ত গলা ভেসে এল। 'একদম টাইট হাওয়া আছে সবগুলোয়।'

তাতে কিছুই বোঝা যায় না, ভাবল ও। কিছুদিন আগে সাগরের তলা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হওয়া এক প্লেনের ফিউজিলাজ উদ্ধার করেছে ডাচরা। ওটার টায়ারেও টাইট হাওয়া ছিল, পঞ্চাশ বছরেও কিছু হয়নি।

'ওকে, গগল।'

'কি করব এখন?'

'রাখো, আসছি।'

যেমন নাম, তেমন আকার ককপিটের। বেশ ছোট। জানালাগুলো অস্বাভাবিক পিচ্চি। ভেতরে পা রাখতেই তেল, ফোম, ঘাম ইত্যাদির গন্ধ নাকে এল রানার। সাথে আরও যেন কিসের গন্ধ। বয়সের। চার দশকের পুরানো অ্যালুমিনিয়াম-লোহা লক্কর ইত্যাদির। সবচেয়ে প্রকট লাগছে ঘামের বদগন্ধ।

অনেকদিন পর খুব আন্তরিকতার সাথে আল্লাকে ডাকল ও। বসে পড়ল পাইলটের পুরু সীটে। সামনের জটিল ইস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছু সময়। স্মৃতি পর্দার পরিচিত ছবিটার সাথে ওগুলো মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। বিশেষ সময় লাগল না, মিলে গেল।

রাশিয়ান ডিজাইনের প্রায় সব বিমানের যন্ত্রপাতি অপারেট হয় উল্টোভাবে। মার্কিন বা অন্যসব দেশের বিমানের সুইচ লিভার যেখানে ওপরদিকে ঠেলে দিলে অন হয়, সেখানে এদের সুইচ অন করতে হলে নিচে টানতে হয়। পুরো

প্যানেলটাও সেই সিস্টেমে তৈরি। ওদেরগুলোর সুইচ বাঁ থেকে অন করতে করতে ডানে যেতে হয়, এদের ডান থেকে বাঁয়ে। বুক ভরে বাতাস টেনে নিল মাসুদ রানা, আঙুল রাখল ডানের প্রথম লিভারে।

টিপে দিল। একটা, দুটো, তিনটে···। তারপরই হেসে উঠল আপনমনে। স্বস্তি ও মুক্তির হাসি। ডায়াল লাইটগুলো সব জ্বলে উঠতে শুরু করেছে, ঘুম ভেঙে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে নিড্ল। চোখে আঙুল দিয়ে রানাকে দেখাচ্ছে ওরা ফুয়েল পাওয়ার, এয়ারপ্রেশার ইত্যাদি যন্ত্রটাকে আকাশে তোলার জন্যে পর্যাপ্ত আছে। আনন্দে একটা হাঁক ছাড়ল ও। এক লাফে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

'গগল, জেনারেলকে তোলো। বুরুজ আলিকে ডাক দাও।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখল ওকে ইটালিয়ান, পরক্ষণে বাঁদরের মত লাফ মেরে নেমে গেল প্লেন থেকে।

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর এনার্জাইস সুইচ টিপল রানা, অ্যাপ্রন কাঁপিয়ে স্টার্ট নিল পোর্ট এঞ্জিন। এর মধ্যে রানার নির্দেশে চাকার নিচের কীলক দুই লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে এসেছে বুরুজ আলি। আর ত্রিশ সেকেন্ড ব্যয় হলো স্টার্টিং সিকোয়েন্স পুরো করতে। এরপর খুব দ্রুত হাতে প্রথমে ফুয়েল লিভার, তারপর পিচ্ লিভার এবং সবশেষে থ্রটল এনগেজ করল রানা এক এক করে। মনে মনে দোয়া-দরূদ পড়ছে তুফান বেগে। নজর সামনে।

হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়ল ওর। এমনিতেই সামান্য আলো ফুটেছে, তার সাথে আরও কয়েকটা নীলচে আলোর বীম যোগ দিয়েছে। নাচতে নাচতে দ্রুত এগিয়ে আসছে অ্যাপ্রনের দিকে।

'ওরা বোধহয় আসছে!' জরুরী কণ্ঠে বলল ও পিছনে দাঁড়ানো গগলের উদ্দেশে। 'ঠেকাও ওদের!'

ককপিট আর কেবিনের মাঝের পার্টিশনে দরজার বদলে ঝোলানো ফ্ল্যাপ সরিয়ে দুদ্দাড় করে ছুটল সে। এঞ্জিনের ঝাঁকিতে দুলছে ইলিউশন। প্রথমটাকে গরম হওয়ার পুরো সময় না দিয়েই স্টারবোর্ড এঞ্জিন অন করল মাসুদ রানা। ভীষণভাবে কাঁপতে আরম্ভ করল প্লেন—ঝরঝর খরখর নানান আওয়াজ উঠছে সর্বাঙ্গ থেকে। পুরানো মেশিনারির বেলায় এ আওয়াজ অস্বাভাবিক নয়, হতেই পারে। কিন্তু ওর চিন্তা যায় না, সারাক্ষণ ভয় হচ্ছে এই বুঝি কোন গুরুত্বপূর্ণ কল-কব্জা খসে পড়ল।

আরও একটা আলোর স্তম্ভ দেখা দিল বাইরে। এটা বেশ জোরাল, নিশ্চই অবজার্ভেশন টাওয়ারের দিক থেকে আসছে। আগেরগুলো প্রায় পৌঁছে গেছে অ্যাপ্রনের গেটের কাছে।

প্যানেলের একটা আলো জ্বলে উঠল—রিয়ার ডোর লাইট। দরজাটা খোলা হয়েছে নির্দেশ করছে। পরক্ষণে আরও কয়েকটা জ্বলল, উইঙের এক্সিট হ্যাচ খোলা হয়েছে কয়েকটা। কোরলা বাহিনীকে ঠেকাতে যুদ্ধপ্রস্তুতি নিচ্ছে পিছনের ওরা।

'তোমার কত দেরি?' ঝড়ের বেগে ছুটে এসে ফ্ল্যাপ সরিয়ে পিটে ঢুকল গগল। 'ওরা তো···'

কথা শেষ করতে পারল না, এক সঙ্গে দুই জোড়া হেডলাইটের আলো দেখা দিল সামনে। সোজা ককপিটে পড়েছে। দৃষ্টি ঝলসে গেল রানার মুহূর্তের জন্যে।

দ্রুত এক হাত তুলে চোখ আড়াল করল। বোঝা গেল গেটের বেশ দূরে আছে এখনও আলোগুলো, ঘুরে এ মুখো হয়েছে সবে। কোনাকুনি এসে হুট করে ঢুকে কিসের কবলে পড়তে হয় ভেবে সাহসে কুলোয়নি হয়তো। তাই একটু ঘুরে, আলো ফেলে দেখে-শুনে আসছে। টাওয়ারের নিক্ষিপ্ত বীম তীরবেগে পেরিয়ে এল দুটো জীপ। পাঁচজন রয়েছে ওদুটোয়। আরেকটা কোথায়? ভাবতে ভাবতে শেষবারের মত প্যানেলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। ওদিকে আলোগুলো এমুখো হতেই আর দেরি করেনি গগল, দৌড়ে চলে গেছে নিজের জায়গায়।

মূর্তির মত বসে আছে রানা স্থির হয়ে, নজর সামনে। এ ছাড়া করার কিছুই নেইও ওর, এঞ্জিন পুরো ট্যান হয়নি এখনও। আরও সময় লাগবে। টেম্পারেচার নিড্‌লের কাঁটা চড়ছে খুব ধীরগতিতে। প্রাণ থাকতে এটা নিয়ে ওড়া যাবে কিনা সেই সন্দেহ পেয়ে বসল হঠাৎ করে। ঘামতে শুরু করল ও।

ডানদিকের জীপ থেকে মাথা বের করে দিল কে একজন, পরমুহূর্তে তার হাতে ঝল্‌সে উঠল তীব্র কমলা-লাল আগুন। ব্রাশ ফায়ারের শব্দ বেমালুম চাপা পড়ে থাকল ইলিউশনের কান ফাটানো গর্জনের তলায়। পিছন থেকে সমানে জবাব দিয়ে চলেছে গগল ও অন্যরা, তাও কান পর্যন্ত পৌঁছল না রানার। গুলি কোনদিকে গেল বোঝা গেল না।

পাশের জীপ থেকেও শুরু হলো গুলি। মনে হলো সোজা ককপিট সই করে ব্রাশ ফায়ার করছে ওরা। রানাকে শেষ করে, নয়তো এঞ্জিন বা টায়ার কিছু একটা অকেজো করে দিয়ে ঠেকাতে চায় ওদের। জীপ আরেকটার চিন্তা এরমধ্যেও ভোলেনি ও। গেল কোথায় ওটা?

হঠাৎ বাঁ দিকের জীপটা প্রবল এক ঝাঁকি খেল। মাতালের মত খানিক ডানে-বাঁয়ে করল ওটা, তারপর সাঁ করে বাঁ দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। মুহূর্তে গতি কমে গেল অন্যটার, থেমে পড়ল চট্‌ করে। আবার চলতে শুরু করল মুহূর্তখানেকের দ্বিধা কাটিয়ে, তবে সোজা আর এল না। অ্যাপ্রনের বাইরে বড় এক বৃত্ত রচনা করে অনবরত ঘুরছে আর গুলি করছে। একটু পর অন্যটাও ফিরে এসে যোগ দিল ওটার সাথে। টাওয়ারের আলোটা আচমকা নিভে গেল। এমনিই, না গুলি করে নেভানো হলো বোঝা গেল না।

প্লেনের যত্রতত্র বিঁধছে গুলি, টেরই পেল না রানা। যদিও বুঝতে পারছে না লেগে পারে না। মনে মনে ও কেবল প্রার্থনা করছে যেন প্রপেলার বা ফুয়েল ট্যাঙ্কে না লাগে।

তখনই দেখা দিল তৃতীয় জীপ। এতক্ষণ পর কেন, সে রহস্যের কারণ অবশ্য বোঝা গেল না। কামানের গোলার বেগে ছুটে আসছে ওটা।

পিচ্‌ আরপিএম ম্যাক্সিমাম শো করছে কাঁটা, মিকশ্চার অটোও পর্যাপ্ত। আর দেরি করা বোকামি হবে। ফ্ল্যাপস্‌ টোয়েন্টি ডিগ্রীতে সেট করল মাসুদ রানা, থ্রটল ঠেলে ব্রেক রিলিজ করে দিল। দুলে উঠে রওনা হলো ইলিউশন। এলোমেলো করে রাখা দুই সারি প্লেন ও কপ্টারের মধ্যে দিয়ে দ্রুত গেটের দিকে এগোতে শুরু করল। নাক উঁচু অতিকায় বিমানটা একদম সোজা আসছে দেখে পিলে চমকে গেল তৃতীয় জীপের ড্রাইভারের। সোজা অ্যাপ্রনে ঢোকার ইচ্ছে ছিল ওটার।

শেষ সময়ে মত পাল্টাল চালক, দ্রুত হুইল ঘোরাতে গেল। গতির তোড়ে সঙ্গে সঙ্গে এক পাশের দুই চাকা শূন্যে উঠে গেল গাড়ির। কাৎ হয়ে বিশ-পঁচিশ গজ এগোল ওটা, তারপর আছড়ে পড়ে আগুনের ফুলকি তুলে ছিটকে সরে গেল রানার পথ থেকে। পরের দৃশ্য আর দেখা হলো না। অন্য দুটোর একটা তখন ইলিউশনের পিছু নিয়েছে চক্কর বন্ধ করে। আরেকটা মনে হলো অন্য কোনদিকে দৌড় লাগাল।

খড়মড় করে উঠল রেডিও। টাওয়ারের ডিউটি অফিসার চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। মুচকে হেসে সেট অফ করে দিল রানা। ফিল্ডের মাঝে পৌঁছে ডানের রানওয়ে ধরল ও ব্যস্ত হয়ে। এবং তক্ষুণি ভুলটা চোখে পড়ল। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল টাওয়ারের ছাদে বসানো ওয়েদার 'টি'র মাথা উল্টোদিকে নির্দেশ করছে—বাতাসের সাথে ঘোরে ওটা, অর্থাৎ বাতাসের বিপরীতে ঘুরিয়ে ফেলেছে ও প্লেন। কিন্তু এখন আর ভুল সংশোধনের উপায় নেই। ঘুরে সঠিক দিকে যাওয়া অসম্ভব। কারণ যেদিকে চলেছে, সেদিকেই প্লেন সোজা রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে রানা। নাক কেবলই এদিক-ওদিক ঘুরে যেতে চায়।

এর আসল কারণ হচ্ছে ইলিউশনের গঠনপ্রকৃতি। ল্যান্ডিং গিয়ার অন্য সব প্লেনের মত ট্রাইসাইকেল নয়, সামনের দুটো চাকায় ভর করে ছোটে এগুলো নাক উঁচু করে, টেইল ছোটে প্রায় মাটি ঘষে। অবশ্য দৌড়ের গতি যত বাড়ে, টেইলও ক্রমেই তত ওপরে ওঠে। অনভ্যস্ত রাইডার বাইকের পিছনে যাত্রী নিয়ে চলতে গেলে যেমন বেসামাল হয়ে পড়ে, ওরও হয়েছে তাই।

গ্রাউন্ড স্পীড ষাটে তুলে ফেলেছে মাসুদ রানা। ওরই ফাঁকে ফিল্ডের অন্যদিকের এয়ারমেনস মেসের ওপর চোখ পড়ল। বেশ কয়েকটা মৃতদেহ এখানে-ওখানে পড়ে থাকতে দেখল ও। কাছেপিঠে তাদের অস্ত্রও দেখা যাচ্ছে। ঘুমের পোশাকে আছে তারা। তৃতীয় জীপের দেরির রহস্য বোঝা গেল। ওদের শেষ করতে গিয়েছিল ওটার আরোহীরা।

আফসোস হলেও এ মুহূর্তে কিছু করার নেই, কাজেই সামনে মন দিল রানা। গ্রাউন্ডস্পীড সত্তর ছাড়িয়েছে, কন্ট্রোল প্যানেল যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিটা ইন্সট্রুমেন্ট স্বাভাবিক কাজ করছে। সামনে রানওয়ে শেষ হয়ে আসছে খুব দ্রুত। এমন সময় আরেক জীপের ওপর চোখ পড়ল ওর, সোজা সামনে থেকে ছুটে আসছে। রানাকে এই রানওয়েতে ঢুকতে দেখে তৎক্ষণাৎ কোনাকুনি দৌড় লাগিয়েছিল ওটা সামনে থেকে বাধা দেবে বলে। মনে হলো যেন মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটাতে চায় চালক।

হুড খোলা জীপের। পিছনে হুড সাপোর্টারে পিঠ ঠেকিয়ে আছে দু'জন, হাতে রুশ একে অ্যাসল্ট রাইফেলের ইয়োগোস্লাভ সংস্করণ, সিক্সফোর-এ অটোম্যাটিক। জীপের সাথে তাল রেখে দুলছে ওরা ডানে-বাঁয়ে। গতি বেড়ে যাওয়ায় টেইল ওপরে উঠে গেছে প্লেনের, পেট এখন রানওয়ের প্রায় সমান্তরালে। কাজেই দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ঘর্মাক্ত রানা। শত্রুর খুব সহজ টার্গেটে পরিণত হয়েছে এখন ও। তবু, থামার তো প্রশ্নই আসে না, গতি কমানোর উপায়ও নেই, অতএব সোজাই চলতে থাকল রানা। শেষ মুহূর্তে পথ থেকে সরে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা

করেছিল জীপের চালক, কিন্তু সফল হলো না। সাঁৎ করে ওটাকে বিমানের পেটের নিচে সেঁধিয়ে পড়তে দেখে আঁতকে উঠল ও। মাঝারি একটা ঝাঁকি খেল প্লেন, তবে ভাগ্য ভাল যে দুর্ঘটনা ঘটল না, চলা অব্যাহত থাকল।

এদিকে রানওয়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছে দেখে ব্যাকপ্রেশার দিল ও, উড়ি উড়ি করেও মাটির মায়া ত্যাগ করতে পারছে না ইলিউশন—গ্রাউন্ডস্পীড এখন প্রায় নব্বই। কন্ট্রোল কলাম ধরে থাকা হাতের পেশীতে চাপ সামান্য বাড়াল রানা, সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিগন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল প্লেনের পেটের নিচে, ডানা মেলেছে মান্ধাতা আমলের ইলিউশন-২।

লেফট রাডারের ওপর চাপ অব্যাহত রাখল রানা, যাতে সোজা থাকে ওটার নাক। খানিক পর বাঁক নিল, তখনই নিচে বড় এক অগ্নিকুণ্ড দেখা গেল। জীপটা পুড়ছে। তিনটে জীবন্ত মশাল গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

সোজা পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল রানা, কোর্স সেট করল পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে। একশো নট গতিতে অ্যাড্রিয়াটিকের দিকে ধেয়ে চলল ওরা। ইটালির উপকূলের দিকে।

'ওয়াও!' ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিল গগল। 'আবারও হোয়াইট অ্যান এস্কেপ, কি বলো, রানা?' বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিল সশব্দে।

'হ্যাঁ, বোসো,' পাশের সীটটা দেখিয়ে কপালের ঘাম মুছল ও।

'বসব পরে। আগে বলো তোমার ফায়ার বক্সটা কোথায়, কয়লা ভরতে হবে।'

মুখটা হাঁ করে দেখাল রানা।

তেরো

সিগারেট ধরিয়ে বুক ভরে ধোঁয়া টেনে নিল রানা। উইন্ডো দিয়ে নিচে তাকাল। পরিষ্কার দেখা যায় না কিছু, তারওপর হালকা এক মেঘের পর্দা আড়াল করে রেখেছে দৃশ্যপথ। 'জেনারেলের কি অবস্থা?'

চুরুট ধরাবার ফাঁকে শ্রাগ করল ভিনসেন্ট গগল। 'একই। গোলাগুলির সময় চোখ মেলেছিলেন একবার।'

'হুঁম! তার মানে ঘুমোচ্ছেন।'

'মনে হয়।' খানিক চুপ করে থাকল সে। পাশ থেকে বন্ধুকে দেখছে গভীর দৃষ্টিতে। গর্ব আর অহঙ্কার ভরা চাউনি। *'ব্লাযিনি আরনির* (এবার কি), রানা?'

'প্রার্থনা করো।'

চুপ হয়ে গেল গগল। মনে হলো ভাবনায় পড়ে গেছে। পিছনে বিকট শব্দ তুলছে ফ্ল্যাপ অনবরত, অসহ্য লাগছে। ডানে তাকাল গগল, স্টারবোর্ড এঞ্জিনের এগজস্ট থেকে পাতলা সাদা ধোঁয়া বের হচ্ছে।

ওই একই সময় মেটকোভিচের সেই বাড়িটির ছাদে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে

কমান্ডার পোলগার মিলান ও কর্নেল কোরলা, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। কর্নেলের চেহারা বিষণ্ন। মিলানকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র বুঝি ইটের ভাঁটা থেকে বেরিয়েছে—টকটকে লাল হয়ে আছে মুখটা। বাঁ দিকের কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছে।

'গেল!' অস্ফুটে কেবল একটাই শব্দ উচ্চারণ করতে সক্ষম হলো কারমানোভিচ কোরলা। সেই সাথে বুক ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

'এত সহজে?' খ্যাক করে উঠল কমান্ডার। 'আকাশে উড়তে পারলেই বুঝি...' বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল। 'তাড়াতাড়ি আসুন, নোভি পাযারে ওয়্যারলেস করতে হবে। মিজাইল মেরে...' এবারও বাক্য শেষ করল না সে।

এগোল বটে কোরলা, কিন্তু ইলিউশনকে ঠেকানোর আশা ভুলেও ঠাঁই পাচ্ছে না মনে। তা যে হওয়ার নয়, বুঝে ফেলেছে।

ওদিকে এয়ারবেস ছেড়ে পালাচ্ছে তখন অবশিষ্ট স্কোডা। পিছনে প্রাণে বেঁচে যাওয়া পাঁচজনের সাথে সেই অল্পবয়সী লেফটেন্যান্টও বসা। অক্ষত আছে সে। মেজর আর দুই ক্যাপ্টেন মরেছে আগুনে পুড়ে। বাকি পাঁচজনের দু'জন গাড়ি উল্টে পড়ায় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। জীপের পিছনের মেঝেতে পড়ে আছে তারা, অজ্ঞান। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে।

অভিভূতের মত প্লেনটা দেখছে তরুণ লেফটেন্যান্ট। চেহারা দেখে মনে হয় না ব্যর্থতা বিন্দুমাত্র দাগ কাটিতে পেরেছে তার মনে। বরং উল্টোটাই দেখা যাচ্ছে। হাসছে মুচকি মুচকি। প্লেন মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার আগে বিড় বিড় করে বলল সে, '*স্রেকান পুট* (যাত্রা শুভ হোক)।' একটু থেমে আবার বলল, '*সে নাইবোলিয়ে* (ভাগ্য সহায় হোক), *কুভাইতে সি* (ভাল থেকো)।'

নড়ে উঠল গগল। 'ভালয় ভালয় ভাগতে পারলে হয়।'

'সেই জন্যেই তো বললাম প্রার্থনা করতে,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা।

'ইটালির আকাশে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যদি এরমধ্যে আর কোন সমস্যা দেখা না দেয়।'

'কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছ তুমি?'

'সার্ব এয়ার অ্যাটাক অথবা লং রেঞ্জ মিজাইল অ্যাটাক। অ্যাড্রিয়াটিকের ওপর পৌঁছলে হয়তো প্লেন ঘায়েল করার জন্যে কিছু একটা করবে ওরা। এতদূর পর্যন্ত তাড়া করে এসেছে, শেষ চেষ্টা একবার করবে না?'

চোখ কুঁচকে রানাকে দেখল গগল। 'কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে যেন তুমি মোটেই চিন্তিত নও তা নিয়ে! যেন হামলা হলেই খুশি হও?'

তখনই জবাব দিল না রানা। নীরবে হাসল। একটুপর বলল, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি ঘাবড়ে গিয়েছ, ঠিক?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল ইটালিয়ান। 'তুমি ঘাবড়াওনি?'

'অবশ্যই ঘাবড়েছি। রীতিমত ভয়ে ভয়ে আছি।'

'হাসি বুঝি ভয়ের লক্ষণ?'

'না। আসলে এসবে অভ্যস্ত আমি, গগল। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুভয়, রোমাঞ্চ, শিহরণ ইত্যাদি আমার জীবনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। এরকম চরম মুহূর্তে আর দশজনের মতই মৃত্যুভয়ে ভীত হই আমি, আবার এসব না থাকলে জীবন পানসে লাগে।'

কিছু সময় অনুসন্ধানী চোখে ওকে দেখল ইটালিয়ান। 'আজব এক মানুষ তুমি, রানা। তারচেয়েও আজব তোমার প্রকৃতি।'

'পেশা আর নেশা।'

'যদি হামলা হয়, উদ্ধার পাওয়ার চান্স আছে?'

গম্ভীর হলো রানা। 'মিথ্যে আশ্বাস দিতে চাই না। চান্স আছে কি না আমি জানি না। এই লক্কর মার্কা পাখিটা সময়মত যদি উল্টোপাল্টা করে, ইন্সট্রুমেন্টের নির্দেশ না মানে, তাহলে ধরে নাও নেই। আর যদি, মানে...'

'বুঝেছি।' খানিক চুপ করে থাকল সে। 'আরেকটু নিচু দিয়ে ওড়া যায় না, যাতে ওদের রেডার আমাদের ডিটেক্ট করতে না পারে?'

'আধুনিক রেডারকে ওভাবে ফাঁকি দেয়া এখন প্রায় অসম্ভব। আওতার মধ্যে হলে মহাশূন্য থেকে গ্রাউন্ড, সবখানে এয়ারক্র্যাফট ডিটেক্ট করতে সক্ষম আজকালকার রেডার। তাছাড়া এক্ষেত্রে ওরা রেডারের দিকে তাকাবে বলে মনে হয় না। ওদের কমন সেন্সই বলে দেবে আমরা কোন পথে কোথায় যাচ্ছি—সে পথে সবচে' সংক্ষিপ্ত লেন কোনটা। কাজেই এলে নিশ্চিন্ত মনে সোজা সেই পথেই আসবে ওরা।'

চুপ করে থাকল গগল।

'তাছাড়া হাইট লুজ আমি করতে চাই না আরও এক বিশেষ কারণে। যদি সত্যিই আক্রমণ আসে, এটাকে খুব দ্রুত ম্যানিউভার করতে হবে। এদিক-ওদিক, ওপরে-নিচে করতে হবে, হয়তো গ্লাইডও করতে হবে। তখন স্পেস প্রয়োজন হবে। অতএব নিচে নামা চলবে না। ওপরেও ওঠা চলবে না, কারণ তাতে অক্সিজেনের সমস্যা দেখা দেবে।'

মাথা দোলাল গগল। 'বুঝলাম।'

'পিছনে গিয়ে জেনারেলের অবস্থা একবার দেখে এসো। বিরোকে বলো, দড়ি-টড়ি কিছু পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখতে।'

'দড়ি কেন?'

'জেনারেলকে স্ট্রেচারসহ বাঁধতে হবে ফ্লোরের সাথে,' বলল রানা। 'একেবারে পিছনদিকে।'

চোখ বড় বড় করে ওকে দেখল গগল। মাথা ঝাঁকাল। বুঝতে পেরেছে বাঁধাছাদার উদ্দেশ্য। 'ঠিক আছে।'

'দম নিতে যদি বেশি অসুবিধে হয়, নাকের সামনে হাত দিয়ে বেড়া বানিয়ে নিয়ো। তাতে বাতাসের চাপ কম লাগবে।'

'আর কিছু, ক্যাপ্টেন?' উঠে দাঁড়িয়ে বলল ইটালিয়ান।

হাসি ফুটল রানার মুখে। 'বুরুজ আলিকে পাঠিয়ে দাও।'

গগল বেরিয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাপ সরিয়ে উঁকি দিল দানব। সাড়া

দেয়ার আগে কিছু সময় ওর প্লেন চালনা দেখল। প্রকাণ্ড মুখে ঝুলে থাকল পরম শ্রদ্ধা ও গর্বের হাসি। মাসুদ রানাকে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপে দেখার আনন্দে বুকের পরিধি তার আরও দু'ইঞ্চি বেড়ে গেছে। 'আমারে বোলাইছেন, রানা ভাই?'

'হ্যাঁ। তোমার পিছনের বাঁদিকের দেয়ালে একটা মেডিসিন চেস্ট আছে। ওর মধ্যে কিছু এমার্জেন্সি ফ্লেয়ার আছে, বের করো ওগুলো। কাজে লাগতে পারে হয়তো।'

'জে,' অদৃশ্য হয়ে গেল বুরুজ আলি।

ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে নজর দিল রানা। গজগুলো পরীক্ষা করল—ঠিকই আছে। সবকিছু নিজের নিজের কাজ করে চলেছে। আরপিএম সঠিক মাত্রায় আছে, অয়েল প্রেশার ও টেম্পারেচার ইন্ডিকেটর, সব ঠিক ঠিক জায়গায়। এঞ্জিন আওয়াজ করছে যেন শুকনো চিনির ওপর লোহার চাকা গড়াচ্ছে। শব্দ একটু বেশি হচ্ছে, এই যা। আগের মতই ঝরঝর করছে প্রতিটি নাট-বল্টু। ভাইব্রেশনের ঝাঁকি বেশি অনুভূত হচ্ছে।

নিচে তাকাল ও। কোস্টলাইন পিছিয়ে যাচ্ছে ধীরগতিতে। পুব আকাশে রঙের আভাস দেখা দিয়েছে। সে আলোয় নিচে অজস্র রিসোর্ট পল্লী, জেলেপল্লী দেখতে পেল রানা। দিনারিক আলপসের ধূসর পাথুরে দেহ পিছনে পড়ে গেছে, সামনে এখন দিগন্ত বিস্তৃত নীলের খেলা। অ্যাড্রিয়াটিক। ঢেউ আছে অনুমান করল ও সাদা ফেনার অস্পষ্ট আভাস দেখে। বাতাসের বিপরীতে ছুটছে পানি, তাই ঢেউ উঠছে সাগরে। ওপর থেকে নীল আকাশের মত শান্ত, নিশ্চল ওয়েস্টল্যান্ডের মত দেখালেও আসলে যথেষ্ট অশান্ত পানি।

মাইলের পর মাইল পেরিয়ে চলেছে ইলিউশন। রানা প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে যে ওর আশঙ্কা মিথ্যে ছিল। আসবে না ওরা। অহেতুক মাথা গরম করেছে এতক্ষণ।

হাতে লাল রঙের একগাদা স্টিক নিয়ে ফিরে এল বুরুজ আলি। 'পাইছি, রানা ভাই। কি করমু এয়া দিয়া?'

'কতগুলো আছে?'

'কোম না। পেরায় তিরিশটা।'

'গুড! ওগুলো আমার সীটের পাশে মেঝেতে রাখো। তারপর পিছনে গিয়ে দেখে এসো জেনারেলকে বাঁধা হয়েছে কি না।'

দশ সেকেন্ডের মধ্যে খবর নিয়ে এল সে, হয়েছে। তবে সুবিধের হয়নি বাঁধন, বেশি চাপ পড়লে ছুটে যেতে পারে।

একটু ভাবল রানা। 'যদি দেখো প্লেন উল্টাপাল্টা শুরু করেছে, তুমি আর বিরো জেনারেলকে আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকবে ফ্লোরে। বুঝতে পেরেছ?'

'জে।'

'বেশি দোল বা ঝাঁকি খেতে দেয়া চলবে না ওঁকে। অতিরিক্ত দুর্বল শরীর, ক্ষতি হতে পারে।'

'জে। কিন্তু...'

'কি?'

'এতকুন তো ভালই আইলে পেলেন, এহন উল্ডাপাল্ডা করবে কা?'

'করবেই তা বলছি না, করতে পারে। আমার মনে হচ্ছে কোরলা আবারও কিছু একটা ঘটাবার চেষ্টা করবে, হয়তো।'

'অ কয়েন কি!' বিড় বিড় করে বলল দানব। 'হাউশ এহনও মেডে নাই করল্লার?'

অনেক কষ্টে হাসি ঠেকাল ও। 'করল্লা না, কোরলা।'

'কল্লা,' সংশোধন করে নিল সে। 'বুজজি।'

'এখন যাও তুমি,' হেসে ফেলার আগে লোকটাকে ভাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। 'গগল সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর এল ইটালিয়ান। ওকে একা একা হাসতে দেখে বিস্মিত হলো। 'এত খুশির কি ঘটল?'

'সাগরে এসে পড়েছি আমরা। আশা করি দশ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌছে যেতে পারব তোমাদের আকাশে।'

'এবং দম নিতে পারব বুক ভরে।'

'তা নিশ্চিত করে বলার সময় এখনও আসেনি।' সিগারেট ধরাল ও। খেয়াল করল লাইটার ধরা হাত কাঁপছে অল্প অল্প। পেশীতে পেশীতে টান অনুভব করছে। বিপদের আভাস? ভাবল রানা। 'বোসো।'

বসল সে। জানালা দিয়ে নিচে তাকাল। ঠিক তখনই ফ্লোর কাঁপিয়ে ছুটে এল বুরুজ আলি। 'রানা ভাই! পিছনে কি যেন চিক্ চিক্ করতে আছে! মনে অয় পেলেন!'

'জায়গায় যাও!' ধমকে উঠল ও কর্কশ কণ্ঠে। 'যা বলেছি তাই করো।' জানালা দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করল, চোখে পড়ল না কিছু। গগল স্টার সাইড উইন্ডো দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে।

তখনই ঘটল ব্যাপারটা। ভীষণভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করল ককপিট, মনে হলো কোন দানব যেন ইলিউশনের টেইল মুঠোয় চেপে ধরে রেখেছে, মুক্তি পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে ওটা। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রানা, সবে উদয় হওয়া সূর্যের নরম, সোনালী ছটা চিরে পোর্ট উইন্ডোর সামান্য দূর দিয়ে রূপালী ছুরির মত কি যেন হুশ্ করে ছুটে গেল সামনের দিকে। একটা নয়, দুটো।

কিছুদূর গিয়ে একযোগে নাক উঁচিয়ে ধনুকের মত তির্যক রেখা ধরে উঠে যেতে শুরু করল। খুব দ্রুত ঘুরল, চিৎ হয়ে ফিরে আসছে, ওপর দিয়ে গিয়ে ঠিক ইলিউশনের পিছনে, একটু ওপরে অবস্থান নেবে সোজা হয়ে। রানা তখন দাঁতমুখ খিচে রীতিমত কুস্তি করছে অসংখ্য হুইল ও পেডাল নিয়ে। সোনিক ব্যারিয়ার ভেদ করে একেবারে গায়ের ওপর দিয়ে গেছে প্লেন দুটো, তার ধাক্কায় বেহাল অবস্থা ইলিউশনের, বারবার নিচে নেমে যেতে চাইছে।

ওরমধ্যেই ইন্টারসেপ্টর দুটোকে দেখে নিয়েছে ও। গগলের দিকে তাকাল চকিতে, সে-ও কুস্তি লড়ছে। সীটের হাতল আঁকড়ে ধরে মরিয়া হয়ে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করছে। 'এখান থেকে চার-পাঁচটা তুলে নাও,' চেঁচিয়ে বলল রানা

ফ্লেয়ার ইঙ্গিত করে। 'হারি আপ! হারি আপ!!'

ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ফ্লোরে। এরই মধ্যে ঘেমে উঠেছে কপাল। 'ও-ওগুলো কি! কি...'

'মিগ,' চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে রানা ওপরদিকে। চিৎ হয়ে প্রায় মাথার ওপর চলে এসেছে ও দুটো। এখনই অদৃশ্য হয়ে যাবে পিছনে।

মিগ ২১-এফ। মাক্ টু পয়েন্ট টু ফিশবেড, শব্দের চাইতে বহুগুণ দ্রুতগতি সম্পন্ন। ওদের উইঙে ঝকঝক করছে এয়ার-টু-এয়ার অ্যাটল মিসাইল। উত্তাপ অনুসন্ধানী। আকাশে উত্তাপ যেখানে বেশি, সেখানে বিস্ফোরিত হয়। চল্লিশ বছরের পুরানো এক প্রপ ট্রান্সপোর্টের বিরুদ্ধে লেটেস্ট দুই মিগ, বাহ্, ভাবল মাসুদ রানা।

'নিচের দিকে গেলে হত না?' চাপা গলায় বলল ইটালিয়ান।

'কোন লাভ নেই। সাগরে পেট ঠেকালেও বাঁচা যাবে না এখন ওদের হাত থেকে। রেডি হও, আমি বলামাত্র ওগুলোর ইগনাইটর খানিকটা করে ভেঙে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারবে। যত দূরে পারো।'

ইতস্তত করতে লাগল গগল। 'এ দিয়ে কি হবে?'

'যা বলি তাই করো!' ধমক লাগাল ও। ওপর থেকে মিগ দুটো অদৃশ্য হয়ে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'জলদি করো! মাথা ভেঙে ছুঁড়ে মারো!'

বাইরে বিরাট এক বৃত্তরেখা ধরে ঘুরল মিগ। দুটোর নাক মনে হয় যেন ঠেকে আছে পরস্পরের সাথে—এক্সপার্ট ফর্মেশন। ডাইভ দিয়ে নেমে এল। সঠিক জায়গায় অবস্থান নেবে এখনই। ইলিউশনের ককপিটে ওদের কানে তালা লেগে গেল ওগুলোর দুনিয়া কাঁপানো, তীক্ষ্ণ গর্জনে।

'মারো!' গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে উঠল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করল গগল। ইগনাইটর খানিকটা করে ভেঙে ছুঁড়ে মারল ফ্লেয়ার। অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসামাত্র আগুন ধরে গেল ওগুলোয়, তারা-বাতির মত জ্বলতে জ্বলতে নেমে যেতে থাকল ফ্লেয়ার। ঠিক তখনই মিগের ডানায় নড়াচড়া ধরা পড়ল—দুই ডানার স্লিং থেকে দুটো করে চারটে মিসাইল রিলিজ করা হলো।

নিজের মস্তিষ্ক চালু হওয়ামাত্র তার নির্দেশে প্লেন থেকে কয়েক ফুট করে সরে গেল ওগুলো, একই মুহূর্তে প্রপেলারের ধাক্কায় বিদ্যুৎবেগে ছুটল সামনে। সামান্য আগে রয়েছে তাদের লক্ষ্য—ইলিউশনের উত্তপ্ত এঞ্জিন এগজস্ট। সামনের ভিউ মিররে ওগুলোর গতি দেখে মুহূর্তের জন্যে স্থবির হয়ে গেল মাসুদ রানা। অন্তরাত্মা উড়ে গেল। মুহূর্তে মুহূর্তে বড় হচ্ছে চার মৃত্যুদূত। ওদিকে পাক্ খেল দুই মিগ। নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে পাইরোটেকনিক কেমন কাজ করে, পর্যবেক্ষণ করছে পাইলট।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে মিররে মিসাইলগুলোকে দেখছে রানা ও গগল। নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। রাডারে হাত রেখে স্থির বসা রানা। যখন মনে হলো সময় হয়েছে, আচমকা দশ ডিগ্রী বাঁয়ে ঘুরিয়ে দিল প্লেন। তীব্র আপত্তি জানাতে শুরু করল ঝক্কর মার্কা ইলিউশন, মহাচিৎকার জুড়ে দিল প্রতিটা নাট-বল্টু, তবে নির্দেশমত ঘুরল ঠিকই।

আচমকা লক্ষ্য হারিয়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল অ্যাটল, তার কম্পিউটারাইজড ব্রেন বুঝে উঠতে পারল না কি করবে। সেই মুহূর্তেই নিচে একের পর এক ফ্লেয়ার ফাটতে শুরু করল। প্রাচীন ইলিউশনের এগজস্টের বহুগুণ বেশি উত্তাপ ছড়াচ্ছে ওগুলো। ককপিটে বসেও তার আঁচ অনুভব করল ওরা।

দ্বিধা কাটিয়ে উঠল অ্যাটল, নাক নিচু করে ডাইভ দিতে শুরু করল এক এক করে। ছুটল নিচের বহ্ন্যুৎসবের দিকে।

'কি ব্যাপার!' কোঁৎ করে ঢোক গিলল ইটালিয়ান, জানালা দিয়ে মুখ বের করে আহাম্মকের মত তাকিয়ে আছে নিচে। 'কি হলো?'

'ওগুলো তাপ অনুসন্ধানী মিসাইল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রানা। 'ফ্লেয়ারগুলো আমাদের এগজস্ট থেকে বেশি তাপ ছড়াচ্ছে বলে নেমে গেল। এ ব্যাটা সেকেলে,' রাডারে চাপড় দিল একটা, 'তাপ ছড়ায় কম। তাই বেঁচে গেলাম এ যাত্রা।'

অনেক নিচে নেমে পড়েছে ততক্ষণে মিসাইল। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল লক্ষ্যে, উজ্জ্বল কমলা রঙের চারটে সূর্যমুখীর মত খুব দ্রুত পাপড়ি মেলল তারা শূন্যে। ফুলঝুরি ছোটাল আগুনের। ইলিউশনের পেটে উইঙে ঝলসে উঠল তার আভা।

হা-হা করে হেসে উঠল গগল। লাফাচ্ছে ছেলেমানুষের মত। 'গেছে! সব শালা গেছে! দেখো, রানা...'

'ফ্লেয়ার নাও, তৈরি হও আবার,' বাধা দিল ও। নজর মিররে। অনেক পিছনে রয়েছে মিগ দুটো, ছোট্ট রুপালী সুঁইয়ের ডগার মত দেখাচ্ছে। খুব দ্রুত বড় হচ্ছে, আবার তেড়ে আসছে। তৈরি হলো গগল। আস্তিনে কপালের ঘাম মুছে রানাও প্রস্তুত। থ্রটল খানিকটা পিছিয়ে আনল ও, নাক কোনাকুনি সাগরের দিকে তাক্ করে নামতে শুরু করল ইলিউশন। কন্ট্রোল ধরা হাতের পেশী কাঁপছে রানার জোর খাটাতে গিয়ে। চোখের পলকে তিন হাজার ফুট নেমে এল ও, আরও নামছে।

'হাইট লুজ করছ কেন?'

উত্তর দিল না ও, একমনে তাকিয়ে আছে আলটিমিটারের ডায়ালের দিকে। আড়াই হাজার ফুটে নামল ইলিউশন, তারপর দু'হাজারে। আরও নামছে। মিসাইল অ্যাটাকের ফল একই হতে পারে ভেবে পাইলট যদি অন্য মতলব আঁটে, যদি সরাসরি আক্রমণ চালাতে চায়, তাহলে বাজপাখির মত ছোঁ মারতে হবে মিগকে। শতগুণ বেশি গতিতে। যদি তাই ঘটে, ওদের গতিকে ওদেরই বিরুদ্ধে লাগাবার ইচ্ছে আছে রানার।

কিন্তু তাড়া করার লক্ষণ দেখা গেল না ওদের মধ্যে। বেশ ভদ্র দূরত্ব রেখে অনুসরণ করছে। 'করছে কি ওরা?' রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল গগল। 'দেরি করছে কেন?'

'টস করছে মনে হয় কয়েন দিয়ে। কে আগে আমাদের হজম করবে, তাই ঠিক করছে।' আরেকবার কপালের ঘাম মুছল মাসুদ রানা।

পোর্ট সাইডের মিগ আচমকা কাৎ হলো, ক্লাসিক নাচের ভঙ্গিমায় আলাদা

হয়ে গেল সঙ্গীর কাছ থেকে। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ধেয়ে এল। ইলিউশনের স্টার্নে এসে পজিশন নিতে চাইছে। মনে হলো আরেকবার মিসাইল অ্যাটাক চালাবে। কিন্তু রানা সুযোগ দিল না। নামা অব্যাহত রেখে ডানদিকে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিল দ্রুত। ওর এয়ার স্পীড ইন্ডিকেটর সর্বোচ্চ সীমায় স্থির, কিন্তু আলটিমিটার শো করছে বিমান বিপদসীমারও অনেক নিচে নেমে গেছে। তবু পরোয়া নেই রানার।

মিগও ঘুরল ইলিউশনের লেজে নাক বাধিয়ে। সামনেরটাকে অনুসরণ করার স্বার্থে পাইলট বাধ্য হয়েছে ডাইভ করতে। আক্রমণ চালানোর জন্যে এতই অস্থির সে, এতই বেখেয়াল যে হাইটের ব্যাপারটা বেমালুম ভুলেই বসে আছে। মন্থরগতির ইলিউশনের দ্বারা যা সম্ভব, তা যে বিদ্যুৎগতির মিগের জন্যে কেবল অসম্ভবই নয়, অকল্পনীয়ও, সে চিন্তা মাথায় আসেনি।

নামছে ইলিউশন—পনেরোশো··· চোদ্দশো··· তেরোশো···

'রানা!' সশব্দে আঁতকে উঠল গগল, চোখ কপালে তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ককপিট সোজা অ্যাড্রিয়াটিকের ধেয়ে আসা দেখে হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। 'কি করছ!'

গর্জে উঠল মিগের হেভি মেশিনগান, ইলিউশনের নরম ফিউজিলাজের এখানে-ওখানে, উইঙে বিঁধল অসংখ্য গুলি। এত বড় বড় ফুটো হলো যে ওরমধ্যে অনায়াসে হাতের মুঠো ঢুকে যায়। কেবিনের মাঝামাঝি জায়গায় চোখ ধাঁধানো আলো ঝলসে উঠল। পিঠে আগুনের ভাপ লাগল ওদের, ফ্লোরবোর্ড থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠে ভরে ফেলল কেবিন-ককপিট। বুলেটের ধাক্কায় থর থর করে কাঁপছে ইলিউশন—ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত। গোঙাচ্ছে।

'প্লেন তোলো, রানা!' আতঙ্কে কাঁপতে শুরু করেছে গগল। বুঝে ফেলেছে বাঁচার পথ নেই, এখনই সাগরে ক্র্যাশ করতে যাচ্ছে ওরা।

কোনদিকে খেয়াল নেই রানার। শক্ত করে কন্ট্রোল ধরে বসে আছে। ঘামছে দরদর করে। চোখ অলটিমিটারের ওপর। মনে মনে প্রার্থনা করছে সময়মত যেন সাড়া দেয় লক্কড়।···বারোশো··· এগারোশো··· এক হাজার···নয়শো···। নড়ে উঠল ও, বিদ্যুৎ খেলে গেল দেহে।

ঝট্ করে ফ্ল্যাপ লিভার ঠেলে দিল সামনে। একই মুহূর্তে কন্ট্রোল কলাম দু'পায়ের ফাঁকে যতদূর আসে টেনে নিয়ে এল হ্যাঁচকা এক টানে। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ভীষণভাবে শিউরে উঠল ইলিউশন একেবারে অন্তিম মুহূর্তে নতুন করে টেক অফ করতে গিয়ে। আচমকা লেজ দাবিয়ে অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে নাক তুলল কাঁপতে কাঁপতে। ঝাঁকি খাচ্ছে ভীষণভাবে।

জমে গেল মিগের পাইলট। ইলিউশনের পিঠের ওপর পৌঁছার ইচ্ছে ছিল, প্রায় পৌঁছেও গিয়েছিল, এমন সময় তার ফ্লাইট পাথে নাক তুলে দিয়েছে বুড়ো গাধাটা। সরাসরি সংঘর্ষ এড়াতে কন্ট্রোলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিল সে। নাক নিচু করে প্রথমটা থেকে বাঁচল। এবং তখনই সামনের পাইলটের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে পাতা ফাঁদটা চোখে পড়ল তার। আঁতকে উঠল সে।

ইলিউশনের তলা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েই টেক অফের চেষ্টা করল মিগ। ওপর

থেকে পাইলটকে মরিয়া লাফ-ঝাঁপ করতে দেখে বিজয়ের হাসি ফুটল রানার ঘামে ভেজা চটচটে মুখে।

এক হাজার ফুটেরও কম ব্যবধান তখন সাগর ও মিগের মধ্যে। শব্দের চেয়ে দ্রুতগতির মিগের টেক অফের জন্যে এই দূরত্ব প্রয়োজনীয় স্পেসের অর্ধেকও নয়। খুব স্বল্পস্থায়ী হলো পাইলটের আপ্রাণ সংগ্রাম। মান্ধাতা আমলের পূর্ব পুরুষের কাছে পরাজিত হলো অত্যাধুনিক মাক্ টু পয়েন্ট টু ফিশবেড। সাগরের দিকে ছুটে গেল ওটা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। নিয়ন্ত্রণ যে পুরোপুরি হারিয়েছে পাইলট, বোঝা গেল ওটাকে ঘন ঘন স্কিড ও স্লাইড করতে দেখে। ককপিটের ক্যানোপি সরে যেতে দেখল রানা, হেলমেট পরা দুই লিলিপুট উন্মত্তের মত বেরিয়ে আসার সংগ্রামে ব্যস্ত।

পেট দিয়ে সবেগে আছড়ে পড়ল ওটা সাগরে, দু'দিকে লাফিয়ে উঠল সাদা ফোম আর পানির ঝরনা। পরমুহূর্তে এক উইঙের ওপর চড়ে বসল বিশাল ঢেউ, উল্টে গেল মিগ। রূপালী পেট ভাসিয়ে দুলতে থাকল ডানা মেলা মরা সীগালের মত। খানিক পর আস্তে আস্তে ডুবে যেতে আরম্ভ করল। লিলিপুট দুটোকে আর দেখা গেল না।

হৈ-হৈ করে ককপিট মাথায় তুলল ভিনসেন্ট গগল। প্লেন সোজা করার সংগ্রামে ব্যস্ত রানার পিঠ চাপড়াচ্ছে ঘন ঘন। 'ওহ্, কি এক ডগ ফাইট দেখালে, দোস্তো!'

ওয়াল মাউন্টেড এক্সটিংগুইশার দেখাল রানা। 'কেবিনের আগুন নেভাও তাড়াতাড়ি। ওদের অবস্থা দেখে এসো।'

সে বেরিয়ে যেতে চারদিকে নজর বোলাল ও। সারাদেহে অসংখ্য ফুটো ইলিউশনের, ককপিট জঞ্জালে বোঝাই। ওদিকে স্টারবোর্ড এঞ্জিন করুণ সুরে ব্যাকফায়ার করছে, হেঁচকির সাথে তেলতেলে ধোঁয়া ছাড়ছে। গিল থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে এরইমধ্যে কালো করে তুলেছে উইঙ। গগলের ফিরতে দেরি দেখে মনের মধ্যে নানান আশঙ্কা উঁকি দিতে শুরু করল। জেনারেল! ওঁর কিছু হয়নি তো? বুরুজ আলি, বিরো অক্ষত আছে? নাকি···

এঞ্জিন এক্সটিংগুইশার চালু করে দিল রানা, ফোম দিয়ে ঢেকে দিল জ্বলন্ত উইঙ। তিন মিনিট পর পরনের কাপড়ে তেল-কালির পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ফিরল গগল। 'কোন চিন্তা নেই, রানা। পিছনে সবাই ভাল আছে। জ্ঞান ফিরেছে জেনারেলের, বিরোর সাথে এক-আধটা কথাও বলছেন তিনি।'

'তাই নাকি?' আড়চোখে দ্বিতীয় মিগটা দেখছে ও। এখনও আক্রমণের মহড়া শুরু করেনি, সঙ্গীর জন্যে শোক প্রকাশ করছে বোধহয়।

'হ্যাঁ। জানতে চেয়েছেন প্লেন কে চালাচ্ছে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে।' চুরুট ধরাল ইটালিয়ান, তখনই চোখ পড়ল স্টারবোর্ড সাইডের থেমে থাকা প্রপেলারের ওপর। 'সে কি! ওটা চলছে না?'

'দেখতেই পাচ্ছ।'

'কিন্তু···' জানালা দিয়ে মিগটাকে দেখল। 'এক এঞ্জিনে···সম্ভব হবে ওটাকে হ্যান্ডেল করা?'

'না। সে ক্ষমতা আর নেই ইলিউশনের। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা অবশ্য যাবে

কোনমতে, যদি ওটা তাড়া না করে।'

'আর কতদূর আমাদের এয়ারস্পেস?'

'পাঁচ মিনিট সময় পেলে...' থেমে গেল ও মিগটাকে তৎপর হয়ে উঠতে দেখে। বারদুয়েক ডানে-বাঁয়ে করে কোনদিক থেকে আক্রমণ চালাবে ঠিক করে নিল বোধহয়। চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হলো মাসুদ রানা। এবারের হামলার ফল কি হবে খুব ভালই জানে। তাই আবার নেমে যেতে শুরু করল। গ্লাইড করে এগোতে থাকল।

দৌড় প্রায় শুরু করেই দিয়েছিল মিগ, শেষ পর্যন্ত থেমে গেল দ্বিধায় পড়ে। রানাকে হাইট লুজ করতে দেখে সাহস হলো না হয়তো। সঙ্গে সঙ্গে গগলকে ফ্লেয়ার নিয়ে তৈরি হতে বলল রানা। জানে, এমনি এমনি ফিরে যাবে না ওটা, শেষ চেষ্টা একবার অবশ্যই করবে। ভাবনাটা শেষ হয়নি, ওটার স্লিঙের বন্ধনমুক্ত হলো একজোড়া মিসাইল, ধেয়ে এল।

নির্দেশ দিতে হলো না, সময়মত ইগনাইটর ভেঙে ফ্লেয়ার ছেড়ে দিল গগল। পোর্ট এঞ্জিন নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ওপরে তুলে নিয়ে চলল ইলিউশনকে। রানার আশঙ্কা হলো এবার হয়তো কাজ হবে না, কারণ ফ্লেয়ার ফুটতে সময় বেশি নিচ্ছে। তাছাড়া এগজস্টের সাথে ওগুলোর দূরত্ব বেশি হলে অ্যাটল লক্ষ্য পরিবর্তনে আগ্রহী না-ও হতে পারে। শেষ পর্যন্ত ওর আশঙ্কা মিথ্যে হলো। সাত-আটটা ফ্লেয়ার ছুঁড়েছিল গগল, এত উত্তাপ অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল না মিসাইলের।

বিপজ্জনক কাছে এসে পড়া সত্ত্বেও নিচের আতসবাজীর আহ্বানে সাড়া দিল ওরা। গোঁত্তা খেয়ে নেমে গেল।

এবারের বিস্ফোরণের আলোর ঝলক অনেক জোরাল হলো। কারণ এখানে এখনও ফোটেনি দিনের আলো। সবে ফুটি ফুটি করছে।

আর এগোল না মিগ। লেজ ঘুরিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল। যাওয়ার সময় একবার সূর্যের ঝলক দেখিয়ে গেল ওদের। পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে সামনে নজর দিল রানা। পেসকারার দিকে যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে আঁধার।

ইটালিতে আলো ফোটেনি এখনও।

'একদিনে দু'বার সূর্যোদয় দেখতে পাব কোনদিন ভাবিনি, রানা,' আনমনে বলল ভিনসেন্ট গগল।

'আমিও না।'

চোদ্দ

অ্যাড্রিয়াটিক পাড়ি দিয়ে যখন পেসকারার আকাশে পৌঁছল ইলিউশন-টু, তখন সবে আলো ফুটছে ইটালিতে। এখানেও আরও একবার প্রায় অসাধ্য সাধন করল মাসুদ রানা। ইলিউশনের মিনিমাম দৌড় ক্যাপাসিটি ছয় হাজার ফুট, সেখানে খুদে এক প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপের মাত্র চার হাজার ফুট রানওয়েতে ওটাকে ল্যান্ড করাতে

হলো ওকে।

প্লেনের বাইসাইকেল ল্যান্ডিং গিয়ার সরু রানওয়ে স্পর্শ করার সাথে সাথে ব্রেক পেডালের সঙ্গে রীতিমত কুস্তি শুরু করে দিল রানা। টারমাকের সাথে টায়ারের ঘর্ষণে এত বিকট শব্দ হলো, ভয় হলো বুঝি রোম থেকেও তা শোনা যাচ্ছে। পুরো এলাকা কাঁপিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল ইলিউশন, রাবার পোড়ার উৎকট গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

রানওয়ের একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে দুটো সীমানা-খুঁটির সাথে ধাক্কা খেয়ে তবে থামল প্লেন। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত বেল আউট করতে হবে বুঝি। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। কোথাও আগুন ধরার কোন লক্ষণ দেখা গেল না বুড়ো ইলিউশনের।

ততক্ষণে খবর হয়ে গেছে। গাড়ি নিয়ে ছুটে এল স্ট্রিপের সিকিউরিটি চীফ। চোখে তখনও পুরো ঘুম তার। প্লেনের পিছনে গাড়ি পার্ক করে ছুটে এল লোকটা। মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিল। কিন্তু খোলা দরজার সামনে গগলকে দেখামাত্র তোতলাতে আরম্ভ করল। বিস্ময়ে চুলের সীমান্তে পৌঁছে গেল তার ভুরু।

'সেনিয়র, আপনি!'

মারফতি হাসি দিল গগল। 'হ্যাঁ। অ্যাড্রিয়াটিকের ভোরের তাজা বাতাসের স্বাদ নিতে গিয়েছিলাম।'

ওর রসিকতা লোকটার কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। একই দৃষ্টিতে একবার ওকে, আরেকবার প্লেনটাকে দেখছে। 'বসনিয়ান প্লেন! সেনিয়র আপনি···ওরে সর্বনাশ!'

'কিসের সর্বনাশ?'

'জানাজানি হলে স্ট্রিপের লাইসেন্স নির্ঘাত বাতিল হয়ে যাবে।'

'আরে রাখো!' ধমকে উঠল গগল। 'কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে লাইসেন্স বাতিল করে তোমার!'

'না, মানে···'

'থামো! তোমার ম্যানেজারকে ফোন করো গিয়ে। বলবে আমার মোবাইলে যোগাযোগ করতে। আগামী কয়েক ঘণ্টা ব্যস্ত থাকব আমি। বুঝলে?'

কিছুই বুঝল না লোকটা। তবু মাথা ঝাঁকাল। 'জ্বি।'

'তোমার গাড়িটা রেখে যাও। আমার লাগবে।'

'জ্বি?'

'বলছি গাড়ি রেখে যাও, আমার লাগবে। একজন সিরিয়াস রোগী নিয়ে এখনই হসপিটালে যেতে হবে আমাকে। কই, রানা,' ভেতর দিকে মুখ করে হাঁক ছাড়ল সে। 'জলদি করো!'

এক ঘণ্টা পর গগলের পরিচিত এক ডাক্তারের নিজস্ব অত্যাধুনিক ক্লিনিকে শুরু হলো জেনারেলের অপারেশন। থিয়েটারের বাইরে অস্থির প্রতীক্ষায় থাকল রানা ও গগল। দেড় ঘণ্টা পর বের হলো ডাক্তার, মুখে মৃদু হাসি—অপারেশন সফল হয়েছে। অবশ্য রক্ত দিতে হয়েছে প্রচুর।

'কে ভদ্রলোক, বলো তো?' জানতে চাইল ডাক্তার। 'চেহারা বেশ চেনা

চেনা মনে হলো যেন!'

'পরে শুনো,' তার সাথে হাত মেলাল গগল। 'তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমার আজকের এই উপকারের কথা মনে থাকবে আমার।'

'কি যে বলো না! আমি তো আমার কর্তব্য করেছি।'

গগলের আস্তানায় খেয়েদেয়ে সেঁটে ঘুম দিল মাসুদ রানা। বুরুজ আলি ও বিরো ঘুমাচ্ছে পাশের রুমে। সন্ধের আগে রানার ঘুম ভাঙাল গগল। হাসছে মিটিমিটি। 'ব্যাপার কি?' জানতে চাইল ও।

'জেনারেলের জ্ঞান ফিরেছে। আর...'

'আর?'

'তোমার বন্ধু কিয়েরযেক ঘাঁটি পুনর্দখল করে নিয়েছে। কনফার্মড নিউজ।'

'কে দিল খবর?' খুশি হয়ে উঠল রানা।

'বিবিসি।'

'আচ্ছা! বাইরেও সবাই জেনে গেছে তাহলে?'

'হ্যাঁ। ওদিকে স্ট্রিপের মালিক লোকটাকে আজ অনেকক্ষণ ধরে জেরা করেছে পুলিস। বসনিয়ান প্লেন কি করে তার স্ট্রিপে এল, কে এনেছে, এইসব জানতে চেয়েছে আর কি!'

'তারপর?' বলল রানা।

'তারপর আর কি!' হাসল গগল। 'ও ব্যাটার ভদ্রলোকের এক কথা, "আমি জানি না। বাইরের প্লেন কি করে দেশের সীমানায় ঢোকে, তা দেখার দায়িত্ব এয়ারফোর্সের, তাদের জিজ্ঞেস করো গিয়ে"।'

হাসল মাসুদ রানা। 'নিশ্চই তোমার শেখানো বুলি?'

'ঠিক ধরেছ।'

'চলো তাহলে, জেনারেলকে দেখে আসি,' উঠে পড়ল ও। তৈরি হয়ে নিল দ্রুত।

পাঁচ মিনিট পর গাড়ি ছোটাল গগল ক্লিনিকের উদ্দেশে।

* * *